দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিরোধীরা হিন্দু ফোবিয়ায় ভুগছে — পৃঃ ৫

রবীন্দ্রনাথের পর এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য উদ্ধত নোবেলের — পৃঃ ১৪

৭২ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ৮ জুন, ২০২০।। ২৫ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

এ ভারত নতুন ভারত

কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সফল হবে না চীনের

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट
एजुकेशनल चैरिटी के
लिए समर्पित है

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৮ জুন - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিরোধিরা হিন্দু ফোবিয়ায় ভুগছে ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ৫

চীনকে বুঝতে হবে এটা নতুন ভারত, আত্মনির্ভর ভারত, আত্মবিশ্বাসী ভারত ▯ সঞ্জয় সোম ▯ ৭

ভারত-চীন সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনা : প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য ▯ বিমল নন্দ ▯ ১০

রবীন্দ্রনাথের পর এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য উদ্ধত নোবেলের ▯ বাসুদেব ধর ▯ ১৪

ভারতের পুনর্গঠনে 'আত্মনির্ভর ভারত' সময়োপযোগী ও সঠিক পদক্ষেপ ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১৬

হালাল সার্টিফিকেশন : ইসলামের অর্থনৈতিক জেহাদ ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১৮

ছ'দশকের অকর্মণ্যতাকে ঝেড়ে ফেলে ভারতকে এক আত্মনির্ভর টগবগে দেশ করে তুলেছেন মোদীজী ▯ অমিত শাহ ▯ ২০

ছত্রপতি শিবাজী : এক বীরগাথা ▯ শুভজিৎ আওন ▯ ২২

কিছু উদ্বাস্তু কাশ্মীরি মহিলার উপার্জনের মাধ্যম খাদি রুমাল ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২৬

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রীর অত্যাশ্চর্য নির্দেশ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা বলিতেছেন, এই সংকটের সময় কোনোরূপ রাজনীতি করা চলিবে না। এইরকম কথা বলিতে ভালো, শুনিতেও ভালো। এমনকী, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ইহাও বলিয়াছেন যে, ত্রাণকার্যে কোনোরূপ দলবাজি তিনি বরদাস্ত করিবেন না। মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলি শুনিলে তাৎক্ষণিকভাবে যে কেহই তাহাকে সাধুবাদ দিতে বাধ্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা শুনিলে মনে হইতেই পারে, এতদিনে বোধকরি সত্য সত্যই রাজধর্মের প্রতি মন দিয়াছেন তিনি। কিন্তু কথায় ও কার্যে অনেক সময়ই প্রভূত ফারাক থাকিয়া যায়। বিশেষত এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও কাজের ভিতর ফারাক বরাবরই প্রকটভাবে বিদ্যমান। ইহার প্রমাণ রাজ্যের মানুষ বহু পূর্বেই পাইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত এক প্রশাসন তিনি রাজ্যবাসীকে উপহার দিবেন। তাহা তিনি দিতে পারেন নাই। বরং দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত একটি প্রশাসন মানুষ প্রত্যক্ষ করিতেছে। স্বজনপোষণ বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও মুখ্যমন্ত্রী ব্যর্থ হইয়াছেন। সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হইবে বলিয়া গালভরা কথা বলিলেও সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহকে পদদলিত করিয়াছেন এই মুখ্যমন্ত্রী। সিন্ডিকেটরাজ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়াও সিন্ডিকেটের পাণ্ডাদেরই তিনি দলে ও প্রশাসনে গুরুত্ব দিতেছেন। অতএব, রাজ্যের মানুষ এতদিনে বুঝিয়া ফেলিয়াছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে যাহা বলেন তাহা তিনি করেন না। তিনি যাহা বলেন তাহা নিতান্তই কথার কথা মাত্র। করোনা ও আমফান ঝঞ্ঝাজনিত পরিস্থিতিতে ত্রাণ লইয়া তিনি যেসকল কথা বলিতেছেন, তাহাও যে নিতান্তই লোক দেখাইবার জন্য যাহা বুঝিতে কষ্ট হইতেছে না। মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলিতেছেন, এই সংকটের সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, ত্রাণকার্যে কোনোরকম দলবাজি বরদাস্ত করা হইবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, এই সংকটের সময় তিনিই সর্বপেক্ষা রাজনীতি করিতেছেন। তাহারই প্রশ্রয়ে ত্রাণকার্যে রীতিমতো দলবাজি হইতেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক নির্দেশে এই নির্লজ্জ দলবাজিটি আরও পরিষ্কার হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, কোনো দল বা কোনো সংগঠন ত্রাণকার্য করিতে পারিবে না। যাহা করিবার তাহা সরকারই করিবে। এইরকম অত্যাশ্চর্য একটি নির্দেশিকা ইতিপূর্বে কোনো সরকারই কখনো ঘোষণা করে নাই। ইতিপূর্বে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ই দেখা গিয়াছে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, মঠ, মিশন সকলেই ত্রাণকার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। অনেক দুর্গম অঞ্চলে সরকারের পূর্বে এই সংগঠনগুলি ত্রাণসামগ্রী লইয়া পৌঁছাইয়া গিয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে কাহাকেও ত্রাণকার্য করিতে বাধা দেওয়া হয় নাই। এই প্রথম দেখা গেল সরকারিভাবে ত্রাণকার্যের উপর এইরকম একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল। কিন্তু এই অদ্ভুত নির্দেশিকা জারি করার অর্থ কী? একটু তলাইয়া ভাবিলেই বোঝা যাইবে, নিতান্তই রাজনৈতিক কারণেই এইরূপ একটি নির্দেশিকা জারি করা হইয়াছে। করোনা ও আমফান বিপর্যস্ত এই রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই ত্রাণকার্যে শাসকদল একেবারেই অনুপস্থিত। বরং, শাসকদলের নেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণের চাল এবং অন্যান্য সামগ্রী চুরি করিবার কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন। উপরন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কর্মীবৃন্দ যেইসব অঞ্চলে ত্রাণ বিলি করিতে যাইতেছেন, সেইসব অঞ্চলে পুলিশের সহযোগিতায় তাহাদের ত্রাণ বিলিতে বাধা দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন সিংহ, নিশীথ প্রামাণিক, জন বার্লা, সুকান্ত মজুমদার, জয়ন্ত রায় প্রমুখকে নিজ নিজ সংসদীয় ক্ষেত্রে ত্রাণ কার্যে বাধা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ দমিয়া যান নাই। তাহারা বাধা অতিক্রম করিয়া ত্রাণকার্যে নিজেদের নিয়োগ করিয়াছেন। কোনোমতেই ভারতীয় জনতা পার্টিকে রোধ করা যাইতেছে না দেখিয়া মুখ্যমন্ত্রী এইবার সরাসরি প্রশাসনকে ব্যবহার করিতে উদ্যোগ নিয়াছেন। বোঝাই যাইতেছে মুখ্যমন্ত্রীর ওই প্রশাসনিক নির্দেশিকার লক্ষ্য একটাই। তাহা হইল— ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রাণকার্যে বাধা সৃষ্টি করা।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ভুল করিতেছেন, বহু অঞ্চলে সাধারণ মানুষ রুখিয়া দাঁড়াইয়া শাসক দলের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। মুখের অন্ন কাড়িয়া লইলে মানুষ যে শক্তিমান শাসককেও ক্ষমা করে না—এই কথাটি মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ রাখিলেই ভালো।

সুভাষিতম্

পরোপদেশবেলায়াং শিষ্টাঃ সর্বে ভবন্তি বৈ।

বিস্মরন্তীহ শিষ্টত্বং স্বকার্যে সমুপস্থিতে।।

অন্যকে উপদেশ দেবার সময় সবাই বিনম্র ও শিষ্ট ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সমস্ত শিষ্টাচার ও উপদেশ ভুলে যায় যখন নিজের সেই পরিস্থিতি উপস্থিত হয়।।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিরোধীরা হিন্দু ফোবিয়ায় ভুগছে

রঞ্জন কুমার দে

পশ্চিমবঙ্গকে সর্বদাই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির পরিবাহক মানা হতো। কিন্তু কমিউনিস্ট আমল থেকে মমতা যুগ পর্যন্ত সনাতনী ভাবধারার ওপর শুধু আঘাতই এসেছে। ভোটের লোভে অনাবশ্যক তোষণ করতে পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কচিকাঁচাদের কোমলমতি মনে হিন্দু ফোবিয়ার বীজ রোপনের নীরব চেষ্টা অব্যাহত। সেজন্যই প্রাথমিক পুঁথিগুলোতে রামধনুর জায়গায় রংধনু, রামপুর হাটকে সরিয়ে রংধনু হাট, আকাশের জায়গায় আসমান করা হয়েছে। রামনামের সঙ্গে আপামর ভারতবাসীর এক আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই হয়তো বার বার ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরানো সংস্কৃতিকে রামবাণে আঘাত করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দৌলতে 'অতীত ও ঐতিহ্যে' নামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে অতি সুপরিকল্পিতভাবে রামকে একটি কাল্পনিক ও নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। বইটির একটি অংশে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'ইংরেজি রোমিং শব্দের অর্থ ঘুরে বেড়ানো। আবার সংস্কৃতে 'রাম' শব্দের একটা অর্থ হলো ভ্রমণশীল! তাই ইংরেজি শব্দে রোমিংয়ের সঙ্গে রামের মিল দেখে বোঝা যায় কোনও এক সময় যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতেই বৃহত্তর ভারত ভূখণ্ডে চলে এসেছিল একদল লোক, যারা ভারতের আদি বাসিন্দাদের পরাজিত করে উত্তরভাগে বসবাস শুরু করে। পরে এই যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরা দক্ষিণের দিকেও যুদ্ধ শুরু করে এবং জেতে। রামায়ণ আসলে এই যুদ্ধজেতা মানুষের গল্প এবং যেহেতু রাবণ ও তাঁর সঙ্গীসাথিরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো, তাই তাদের খারাপ অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে রামায়ণে।' লকডাউনে দেশবাসীকে আনন্দের সঙ্গে ঘরবন্দি রাখতে সরকার আশির দশকের জনপ্রিয় রামায়ণ-মহাভারতের মতো সিরিজগুলো পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করায়। তাতে স্বভাবতই তথাকথিত সেকুলার ও বামপন্থী ব্রিগেড বিরোধিতা করতে থাকে। প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ ও কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল রামায়ণ সিরিজ বন্ধের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় ঘুরেও ব্যর্থ হন। এই গ্যাঙেরই এক মিডিয়া হাউজ টাইমস অব ইন্ডিয়া চরম বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের এক সমীক্ষা রিপোর্টে জানায় দূরদর্শনে রামায়ণ সিরিজ সম্প্রচারিত হওয়ায় চোখের আঘাতের মতো ঘটনা নাকি চরম আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে তির-ধনুক বানিয়ে একে অপরের দিকে ছুঁড়ছে। দূরদর্শনে প্রচারিত রামায়ণ সিরিজ দর্শকের ভালোবাসায় বিশ্বরেকর্ড গড়ে নিন্দুকদের মুখে সজোরে ঝামা ঘষে দিতে পেরেছে।

ভারতের প্রথম শ্রেণীর মিডিয়া হাউজগুলি অনেক আগে থেকেই কী পরিমাণ হিন্দু ফোবিকে (হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা/হিংসা) আক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে বামপন্থী গোষ্ঠীর হিন্দুদের প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে হেয়, যুক্তিহীন, পরিবেশ বিরোধীরূপে উপস্থাপনা করার কোনো কসরতই বাকি নেই। বামপন্থী মিডিয়াহাউজ 'The Quint' রঙের উৎসব হোলিতে প্রচার করে জলের অপচয়, ত্বকের ক্ষতি ইত্যাদি। দীপাবলিতে আলোর উৎসবে বাজি ফাটালে পরিবেশ দূষণ, শিবচতুর্দশীতে শিবলিঙ্গে দুধ ঢাললে গরিব শিশুরা অনাহারে মরে যায় ইত্যাদি। অথচ, এই নিন্দুকেরাই নীরবতা পালন করে যখন উৎসর্গের নামে হাজার হাজার গবাদি পশুকে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে জবাই করা হয় , ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ারের বাজি পটকায় তাদের কিছু আসে যায় না। মিডিয়াকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয় অথচ আজ কোনো জাতীয়তাবাদী মিডিয়া হাউজ যখন মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ খোলার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ তাঁরা হিন্দুফোবিয়ার আক্রান্ত হয়ে ভুয়ো FIR এবং সেই সাংবাদিককে সস্ত্রীক প্রহারও সহ্য করতে হয়। ঠিক তেমনি সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে পালঘর সন্ন্যাসী হত্যার সংবাদ পরিবেশনায় এবং একটি পুরানো দলের অধ্যক্ষের রাজনৈতিক সমালোচনা করায় একই দুর্দশা পোহাতে হয়। জি মিডিয়ার চিফ নিউজ এডিটর সুধীর চৌধরী 'DNA' অনুষ্ঠানে আরবান নকশাল, কাশ্মীরি জঙ্গিবাদ, কেরলের নিষিদ্ধ কট্টরপন্থী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার দেশবিরোধী কার্যকলাপ তথা লাভ জেহাদ প্রকল্প ও সিমির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রতা, CAA-এর সত্যতার পাশাপাশি সম্প্রতি জম্মু শহরে হিন্দুদের জমি দখলে অনৈতিক বস্তি গড়ে তুলে জম্মুকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর বানানোর চক্রান্তের নকশা উপস্থাপিত করেন। এরপর থেকেই তাঁকে জেহাদি গোষ্ঠীর একাধিক ভুয়ো FIR এবং বিভিন্ন হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কাশ্মীর ও কেরলের মধ্যে বৈচারিক, কট্টরপন্থী, জেহাদি ও বামপন্থী ভাবধারার স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাই সুধীর চৌধরীর সম্পূর্ণ

> **সৈয়দ আকবরুদ্দিন, আব্দুল কালাম, ইরফান খানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাফরুল ইসলাম, হামিদ আনসারি, ওবেসি, নাসিরউদ্দিন শাহদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, অন্যথায় ভারতকে ইসলামফোবিয়ার অপবাদ দিয়ে কার্যত নিজের জাতি, সম্প্রদায়কেই সন্দেহভাজন এবং অপমানিত করার নামান্তর হবে।**

রিপোর্টটি জম্মুতে ভুমি-জেহাদের বিষয় হলেও FIR টি কেরালার বামপন্থী বিচারধারার সংগঠন All India Youth Federation-এর এক সম্পাদক করেছেন। কেরল কিংবা কাশ্মীরে কেউ খোলাখুলি বন্দুক হাতে জেহাদ করছে, কেউ বা কট্টরপন্থী চিন্তাধারায়। এই সমস্ত কট্টরপন্থী এলাকায় তদন্তে তিন ধরনের জেহাদি মডিউলের তথ্য সামনে উঠে এসেছে, যথাক্রমে কসারগোড় মডিউল, কন্নুর মডিউল এবং উমর উল-হিন্দ মডিউল। মূলত এরাই লাভ জেহাদ, জঙ্গি কার্যকলাপ এবং রাষ্ট্রবাদী মিডিয়ার টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করছে। কমিউনিস্ট ও কট্টর মৌলবাদী চিন্তাধারায় কেরল জঙ্গিদের মুক্ত বিচরণ কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠেছে। কাশ্মীরের জঙ্গিবাদ শুধু পাকিস্তান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও কেরলের জেহাদি নেটওয়ার্ক সিরিয়া, আফগানিসস্তান, শ্রীলঙ্কা, বিভিন্ন আরবদেশ সহ সারা পৃথিবীতে বিস্তারিত। প্রমাণস্বরূপ ২৫ মার্চ আফগানিস্তানের গুরুদ্বারে ২৫ শিখ শ্রদ্ধালু হত্যার আতংকবাদী মহসিন কেরলের কসারগরের স্থায়ী বাসিন্দা। দেশের সুরক্ষা এজেন্সির সূত্রানুসারে গত কয়েক বছর থেকে কেরলের প্রায় ১০০ থেকে ১২০ জন যুবক জঙ্গিগোষ্ঠী ISIS-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ২০১৪ সালে প্রথম আই এই আই এসের সঙ্গে কেরলের জঙ্গি যোগসূত্র জনসম্মুখে উঠে আসে যখন ১৭ জন ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীর অধিকাংশই কেরলের বাসিন্দা ছিল। তারপর ২০১৬ সালে ২৬ সদস্যের নারী, শিশু সহ কেরলের একটি টিম আইএসআইএসে ভর্তির উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। ২০১৮ সালে আবার ইরাক ও সিরিয়ায় কেরলে ১০ জিহাদির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কেরলকে বর্তমানে সন্ত্রাসের সবচেয়ে হটস্পট এই কারণেও মানা হয় ২০১৬ সাল থেকে Left Democratic Front-এর সরকারের আমলে বিজেপি-আরএসএসের ১২০ জন কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়। এর আগেও কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন United Democratic Front সরকারে ৩৬টি রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। এই দুই ফ্রন্ট পালাক্রমে সরকার চালালেও রাষ্ট্রবাদী রাজনীতি মাথাচাড়া না দেওয়ায় রাজ্য সরকারের পৃষ্টপোষকতায় জঙ্গি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (PFI)-র রমরমা চলছে। কেরলের এই নগ্ন চিত্র সম্প্রচার করায় রাষ্ট্রবাদী মিডিয়া হাউজগুলি জঙ্গিগোষ্ঠীর চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে এবং 'ইসলাম খত্‌রে'র নতুন যুক্তি পেশ করছে।

ভারতে 'ইসলাম বিপদে' প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তানের আইটি সেল অনেক আগে থেকেই ভুয়ো সব আইডি থেকে মিথ্যে তথ্য প্রচার করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরবদেশ-সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোর চেষ্টায় ছিল। সম্প্রতি আলকায়দা প্রধান আয়মান-আল-জাওয়াহিরি এক ভিডিয়ো বার্তায় দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের জেহাদ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতে CAA-এর লাগুকরণ, ধারা ৩৭০ এবং ৩৫(এ)র বিলুপ্তকরণ, রাষ্ট্রবাদী মিডিয়ার তাবলিগ জামাতের সমালোচনা নাকি জেহাদ ডাকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অথচ CAA-তে কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কোনো কথা বলা হয়নি; ধারা ৩৭০ এবং ৩৫(এ) একটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী বিধান যার সমাপ্তিতে দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের ন্যায় সুনিশ্চিত হয়েছে, তাছাড়া ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় মিডিয়া তাবলিগের সমালোচনা করতেই পারে। মৌলবাদী গোষ্ঠীর এই সমস্ত অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ভারতকে ইসলামফোবিক রাষ্ট্রে চিহ্নিত করেছে। একইভাবে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতা সম্পর্কিত মার্কিন সংস্থা United State Commission on International Religious Freedom (USCIRF) ২০২০ সালের প্রকাশিত তাদের একটি রিপোর্টে ভারতকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় ১৪ দেশীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে সেই পুরাতন ভুয়ো ইস্যুগুলো। ভারতকে ইসলাম ফোবিয়ার অপপ্রচারে কিছু সংখ্যক মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং কমিউনিস্ট অপশক্তি সম্পূর্ণ দায়ী। যারা সামান্য ইস্যুগুলোতে সময়ে সময়ে অসহিষ্ণুতার চিৎকারে মেতে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারিসউদ্দিন শাহ, হামিদ আনসারী, আসাদুদ্দিন ওয়েসি প্রমুখ। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক খোলা চিঠিতে দিল্লির সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান জাফরুল ইসলাম খান লিখেছেন হিন্দুদের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে যদি ভারতীয় মুসলিমরা আরবের বন্ধুদের কাছে অভিযোগ কারে। তার এই চিঠিতে বিতর্কিত ধর্মীয় প্রচারক জাকির নায়েককে প্রশংসায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জাকির নায়েক চলতি মে মাসে ঘৃণা ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ছড়ানোর দায়ে ব্রিটেনের সম্প্রচার মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণ কমিটি দ্বারা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান খায়রুল হাসান রিজভি জাফরুলের কড়া নিন্দা করতে গিয়ে জানান, 'মুসলমানরা ভারতকে স্বর্গ মনে করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভারতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বদনাম করার লক্ষ্যেই এইরূপ বিষেদ্গার মন্তব্য। এই সমস্ত মন্তব্য দেশের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে সম্প্রতিতে ফাটল ধরাচ্ছে।' তাই তিনি তৎক্ষণাৎ জাফরুলের গ্রেফতারের দাবি করেছেন। তথাকথিত 'ইসলাম ফোবিয়া'র কৃত্রিম বাতাবরণ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য করে কেন্দ্রীয় মুক্তার আব্বাস নাকভি মন্তব্য করেন যে প্রকৃতপক্ষে 'মোদীফোবিয়া' ক্লাব প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবকা সাথ সবকা বিকাশে হজম না হওয়ায় দেশ ও বিদেশে অহেতুক ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, মুসলমানরা বিপদে প্রভৃতি দুষ্প্রচারে লেগে রয়েছে। ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে কখনো ভালোবাসার মাপজোক হয়নি। তাইতো আব্দুল কালাম আজাদ, ইরফান খানদের প্রয়াণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই কেঁদেছে। গত ৩০ এপ্রিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি থেকে অবসর নিয়েছেন IFS অফিসার সৈয়দ আকবরুদ্দিন। যার নেতৃত্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মুম্বাই হামলার মূল পাণ্ডা হাফিজ সৈয়দকে Global Terrorist ঘোষণা করা হয়। ৩৭০ রদ ইস্যুতে তিনি পাকিস্তানকে চাপে রেখেছিলেন। তিনি নিজের চেয়ারের অপমর্যাদা কোনোদিন করেননি। সৈয়দ আকবরুদ্দিন, আব্দুল কালাম, ইরফান খানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাফরুল ইসলাম, হামিদ আনসারি, ওবেসি, নাসিরউদ্দিন শাহদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, অন্যথায় ভারতকে ইসলামফোবিয়ার অপবাদ দিয়ে কার্যত নিজের জাতি, সম্প্রদায়কেই সন্দেহভাজন এবং অপমানিত করার নামান্তর হবে।

চীনকে বুঝতে হবে এটা নতুন ভারত, আত্মনির্ভর ভারত, আত্মবিশ্বাসী ভারত

সঞ্জয় সোম

এই বছরে চীনের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৭০তম বর্ষপূর্তি। ফলে দুই দেশ জুড়ে সত্তরটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা উদ্‌যাপন করার পূর্বপরিকল্পনা ছিল, করোনা নামক এক চীনা ভাইরাস সে স্বপ্নে যবনিকা টেনে দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র সংক্রমণের উৎস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্ধিহান হওয়া অবধি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন থেমে থাকেনি। ভুটানের ডোকালাম সীমান্তে ৭২ দিন ধরে চোখে চোখ-রাখা পরিস্থিতি শান্ত হতে না হতেই এই বিশ্বব্যাপী করোনা প্রকোপের মধ্যেই পূর্ব লাদাখে গালোয়ান উপত্যকায় লাইন অব একচ্যুয়াল কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর চীন আবার নতুন করে তাদের আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক নৈকট্যই বেজিংয়ের উদ্বেগের মূল কারণ। তাৎক্ষণিক সমস্যা হলো অকসাই চীন সম্পর্কে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নীতি পরিবর্তন ও ভারতের লাগাতার জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপ।

আকসাই চীন এলাকাটি চিরকাল ভারতীয় মানচিত্রের অংশ । লাদাখের বিজেপি সাংসদ জামিয়াং শেরিং নামগিয়ালের স্পষ্ট বক্তব্য হলো জওহরলাল নেহরুর কারণেই ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধের ফলস্বরূপ আকসাই চীন ভারতের হাতছাড়া হয়েছিল। কেন্দ্রে ২০১৪-য় বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই লাদাখ সীমান্তের গালোয়ান উপত্যকা ঘেঁষে ভারত যেভাবে রাস্তাঘাট-সহ অবকাঠামো তৈরি করতে শুরু করেছে তাতে চীন প্রথমবার সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছে এবং ভয়ও পেয়েছে। লাদাখে ভারতের রাস্তা নির্মাণকে তাই চীন একটি হুমকি হিসাবেই দেখতে শুরু করেছে। বিশেষ করে পশ্চিম জিনজিয়াং প্রদেশের কাসগর শহর থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত সামরিক কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যে মহাসড়কটি চীন তৈরি করেছে, তার নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতে আদৌ আর তাদের হাতে থাকবে কিনা, সেই বিষয়ে চীন নিশ্চিত হতে পারছে না। এমনিতেই এই দুটো প্রত্যন্ত প্রদেশের বাসিন্দাদের আনুগত্য নিয়ে চীন সবসময়েই সংশয়িত। উপরন্তু এই

মহাসড়কটি আকসাই চীনের মধ্য দিয়ে গেছে। আর তারা একথাও জানে যে, আজকের নরেন্দ্র মোদীর ভারত আর সেদিনের নেহরুর ভারত এক নয়।

চীনের হৃদ্‌গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে ৫ আগস্ট ২০১৯-এ সংবিধানের ৩৭০ ধারা খারিজের বিতর্কে সংসদে এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে গালোয়ান উপত্যকায় এখন চীন পদক্ষেপ করছে, সেখানে একসময় সাময়িকভাবে অত্যন্ত দুর্বল ভারতের হাতে বিপুল শক্তিশালী চীনা ফৌজকে চরম লোকসান পোয়াতে হয়েছিল। বস্তুত ১৯৬২-র যুদ্ধে গালোয়ান উপত্যকায় চীন যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, সেই স্মৃতি এখনো তাদের তাড়া করে ফেরে। Snow of the Himalayas : Sino-Indian War Records (Chinese Edition 1991) বইতে পিপলস লিবারেশন আর্মির প্রাক্তন অফিসার সুন জিয়াও লেখেন, ''যুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় সেনার গোলাবারুদের ব্যবহার ভয়ানক ক্ষতিকারক ছিল। দু'ঘণ্টার প্রচণ্ড যুদ্ধের পর চীনা সেনা যদিও গালোয়ান উপত্যাকা দখল করতে সক্ষম হয়, তার জন্য মারাত্মক দাম চোকাতে হয়েছিল। ৮৭৪ জন সৈন্যকে আমরা ওই বরফ ঢাকা উপত্যকায় হারাই, ১৯৮০-৮২ সালে যাদের মধ্যে ৮০০-র বেশি সেনার দেহাবশেষ ওখান থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।'' এবার চীন এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণরেখা পার করেনি, কিন্তু করলে কী হবে, সেটা তাদের অজানা নয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তারের চেষ্টা চীন বেশ কিছুদিন ধরেই করে চলেছে। করোনা ভাইরাস মহামারীতে সারা বিশ্ব যখন ব্যস্ত, তখন বেজিং এটাকে একটা লক্ষ্য হাসিলের সুযোগ ব্যবহার করছে। সারা বিশ্বে শেয়ার বাজারের ধসের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির কোটি কোটি শেয়ার কানাকড়ির দামে কিনে নিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির সরবরাহের গোটা দিকটাকে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শুধু ভারত সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করাই নয়, হংকংয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে চীন। গোটা দক্ষিণ চীন-সমুদ্র জুড়ে চীনের সৈনিক গতিবিধিও লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পরেও সংকটে পড়া দেশগুলোকে ঋণ সাহায্য দিয়ে বেজিং এমনভাবেই তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। তবে ২০০৮ আর ২০২০-র মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এবারে কিন্তু করোনা পরবর্তী কালখণ্ডে চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভিন্ন এবং ব্যাপক বেরোজগারি ও খাদ্যসংকটকে কেন্দ্র করে চীনে ভয়ানক গণঅসন্তোষ দানা বাঁধছে। রাষ্ট্রপতি পি জিং পিং-এর নেতৃত্ব আজ প্রশ্নের মুখে। প্রিমিয়ার লি-র সঙ্গে ওঁর নীতিগত মতভেদও প্রকাশ্যে এসে গেছে। ওদিকে চীনের ভেতরেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির গ্রহণযোগ্যতা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে। যেভাবেই হোক শি জিন পিং অভ্যন্তরীণ সংকটের দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। চীনের ইদানীংকার সমস্ত পদক্ষেপই সেই আলোকেও দেখা প্রয়োজন।

এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের স্বার্থে এমন কিছু অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপ করেছেন যা ভারত ও চীনের এযাবৎকার সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রথমত, বহুদিন ধরে চীন ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক সহযোগী ছিল, যদিও রপ্তানির চেয়ে চীন থেকে অনেক বেশি আমদানি করে ভারত। গত বছর বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৩০০ কোটি ডলার। ভারতে এখন মেক ইন ইন্ডিয়ার হাওয়া বইছে, প্রধানমন্ত্রী চাইছেন দেশ আত্মনির্ভর হোক, বিশ্বের অগ্রণী উৎপাদনকারী শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। ফলে ভারত এখন একদিকে যেমন চীন থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতে চলে এলে সবরকম সাহায্য দেবার কথা বলছে। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়েও আর তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ভারত এত দশক পর প্রথমবার তার নিজস্ব স্বার্থরক্ষার প্রতি যে দায়বদ্ধতাটা প্রকাশ করছে, এতদিন ধরে একতরফা মুনাফা লুটে যাওয়া চীনের স্বভাবতই সেটা মোটেও ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয়ত, চীনের বেসরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন লেখায় এমন কিছু মন্তব্য করেছে যাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ভারতকে চীন এখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চীন বিরোধী একটি অক্ষের অংশ হিসাবেই মনে করছে। ২৫ মে, ২০১৯-এর সংখ্যায় একজন চীনা বিশ্লেষক লং শিং চুং উপ-সম্পাদকীয়তে লেখেন, ''ভারত সরকার যেন তাদের দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের কামানের গোলা হিসাবে ব্যবহৃত না হতে দেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপার দুই দেশকেই সতর্ক থাকতে হবে, কারণ যে কোনো সুযোগেই শান্তি এবং স্থিতিশীলতা নষ্ট করা যুক্তরাষ্ট্রের স্বভাব।'' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কোয়ালামপুরস্থিত চীন বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মাহমুদ আলি বিবিসিকে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিকে বাগে আনার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র গত এক দশকে যে একটি 'অক্ষশক্তি' তৈরি করেছে, ভারত তার অগ্রভাগে। আমেরিকা মনে করে চীনকে শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে যে দেশটি তাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে সেটি হলো ভারত। এজন্য গত দশ বছরে তারা ভারতের কাছে ২০০ কোটি ডলারের মতো অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বিক্রি করেছে।'' ফলে নিজেদের সামরিক শক্তি নিয়ে চীন যতই আস্ফালন করুক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণে যে এখন ভারতের গুরুত্ব ও প্রভাব ক্রমবর্ধমান, সেটা চীনকে বিচলিত ও উত্তেজিত, দুটোই করছে।

চীন ও ভারতের মধ্যে তাদের ৩৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে বিরোধ নতুন কিছু নয়। আকসাই চীন অঞ্চলের ১৫০০০ বর্গমাইল ভারতীয় এলাকা চীন দখল করে বসে আছে, যা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন

চীন ব্যাপকহারে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেও নেহাত ব্যবসায়িক মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার দৌলতে এতদিন পার পেয়ে গেছে। এখন তাদের ভয় দেখানোর দিন শেষ, ভয় পাওয়ার দিন শুরু হয়েছে। হয় নিজেরা শোধরাবে, না হয় শুধরে দেওয়া হবে।

ভারতের পক্ষে আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচলকে চীন তাদের এলাকা বলে দাবি করে প্রতিনিয়ত উৎপাত সৃষ্টি করে, সেটাও বন্ধ হওয়া দরকার। করোনার সংক্রমণের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন সারা বিশ্ব, বিশেষত পশ্চিমি দেশগুলো জুড়ে চীনের কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি একটি বিতৃষ্ণার আবহ তৈরি হয়েছে, যা চীনের পক্ষে অশনিসংকেত। তার ওপর ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন্স, তাইওয়ান, তিব্বত, কাজকিস্তান এবং বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ নামক অপরিশোধীয় ঋণ-অস্ত্র ব্যবহার করে এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে চীনা সাম্রাজ্যবাদের যে কদর্যরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তাতে চীন আজ বাস্তবিকই একঘরে। ভারত সীমান্তে চীনের আস্ফালন আসলে এক মনস্তাত্ত্বিক দাবাখেলা, যার জবাব ভারত ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। গত ১৬ বছর ধরে সীমান্তবর্তী যে সমস্ত রাস্তা চুরির ফাঁদে আটকে ছিল, নরেন্দ্র মোদীর সরকার সেগুলোকে প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। ওদিকে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে চীন চোখ রাঙাচ্ছে আর এদিকে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এগারোটা ট্রেন ভর্তি করে ১১, ৮১৫ জন নতুন শ্রমিক নিয়ে গিয়ে ডারবুক-শয়ক-দৌলতবেগের রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে।

চীনকে বুঝতে হবে যে এটা নতুন ভারত, আত্মনির্ভর ভারত, আত্মবিশ্বাসী ভারত। ব্যাপকহারে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেও নেহাত ব্যবসায়িক মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার দৌলতে এতদিন পার পেয়ে গেছে। এখন তাদের ভয় দেখানোর দিন শেষ, ভয় পাওয়ার দিন শুরু হয়েছে। হয় নিজেরা শোধরাবে, না হয় শুধরে দেওয়া হবে। ■

ভারত চীন সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনা

প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

বিমল শঙ্কর নন্দ

গোটা পৃথিবীই এখন কোভিড-১৯ অতি মহামারীতে আক্রান্ত। সমস্ত পৃথিবীই লড়াই করে চলেছে ভয়ংকর করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে। যার সৃষ্টি চীনের উহানে, যে কারণে পশ্চিমে এই ভাইরাসকে উহান করোনা ভাইরাস নামেই অভিহিত করা হচ্ছে। চীনের অস্বস্তি হলেও এটাই বাস্তব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবজাতি এমন মারাত্মক সংকটের মুখোমুখী হয়নি। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই অর্থনীতি এবং সমাজ গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং জাতি-রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করছে এই সংকটের হাত থেকে তাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে রক্ষা করতে। সামাজিক কাঠামোর প্রচলিত রূপগুলি ভেঙে যাচ্ছে, অর্থনীতির যে ব্যবস্থাগুলো বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। রাষ্ট্রগুলিকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়কে নতুন চোখে দেখতে হচ্ছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যে বিশ্বব্যবস্থা ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল (যদিও তা একেবারেই স্থায়ী রূপ ছিল না। বরং তার মধ্যেও ক্রমাগত অদল-বদল চলছিল) তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃত রূপটি কী দাঁড়াবে তা এখনো অনুমানের বিষয়। সমস্ত রাষ্ট্রই কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার সম্ভাব্য রূপ ও চরিত্রটিকে নিয়ে চিন্তিত এবং কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত সে নিয়েও নিজেদের মতো করে চিন্তাভাবনা করছে।

কিন্তু একটি দেশকে এই সবকিছু থেকে বাইরে রাখা যায়। সেই দেশটি হলো গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। গোটা পৃথিবীকে করোনা ভাইরাস 'উপহার' দেওয়ার পরও চীন এবং সেই দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সবকিছু যেন একেবারে স্বাভাবিক, ঠিক আগের মতোই। কোভিড-১৯ পরবর্তী যুগে নিজেকে একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে মশগুল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেই কমিউনিস্ট পার্টি মনোনীত চীনা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব। গোটা দুনিয়ায় নভেল করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার কারণ (যা চীন দেশেই নিহিত) অনুসন্ধানের বদলে চীন এখন সম্ভাব্য ঠাণ্ডা লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে চীনের কৌশলগত অবস্থান তৈরিতে ব্যস্ত। সম্প্রতি চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই মন্তব্য করেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শক্তি চীন-মার্কিন সম্পর্ককে প্রায় পণবন্দি করে ফেলেছে এবং দুটি দেশ এক নয়া ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।" তার কথায় যে প্রচ্ছন্ন বার্তাটি আছে তা হলো যদি সত্যিই পৃথিবীতে আবার ঠাণ্ডাযুদ্ধ বেধে যায় তবে চীন সেই অনুযায়ী তার প্রতিরক্ষা এবং ভূ-কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ চীন মনে করছে আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি তার আছে এবং এই উদ্দেশ্যে এখন থেকেই এশিয়ার অন্যান্য শক্তিকে বিশেষত ভারতকে এক বার্তা দেওয়া প্রয়োজন যাতে সম্ভাব্য ঠাণ্ডাযুদ্ধ কিংবা কোভিড-১৯ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী দেশগুলি যদি চীনের ওপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে ভারত যেন প্রত্যক্ষভাবে সেই উদ্যোগে শামিল না হয়। গত মে মাসে সিকিম সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং চীনের

সেনাবাহিনী পিপল্‌স্‌ লিবারেশান আর্মির মধ্যে হাতাহাতি লড়াইয়ের পর আকসাই চীন অঞ্চলেও চীন এবং ভারতের সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এই পরিস্থিতি অনেকটা ২০১৭ সালের ডোকলাম দ্বন্দ্বের মতো। ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত ভারত, চীন ও ভুটানের সীমানার মিলনস্থল ডোকলাম অঞ্চলে চীন এবং ভারতের সেনাবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তা কোনো সংঘর্ষের রূপ নেয়নি। আকসাই চীন অঞ্চলে ভারত ও চীনের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা প্রত্যক্ষ সীমান্ত সংঘর্ষে পরিণত হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব প্রলম্বিত হতে পারে। গত মে মাসের ১৪ তারিখ ভারতীয় স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষ মনোজ নারাভানে বলেছেন মে মাসের ৫ তারিখে

> **১৯৬২-র মতো অ্যাডভেঞ্চার নিতে গেলে বিপদে পড়বে চীনই। কারণ বর্তমান ভারত এক নতুন ভারত। এই ভারত অনেক শক্তি ধরে। বিশ্বও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।**

লাদাখের প্যাংগং লেক অঞ্চলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপর অন্তত চারটি অঞ্চলে এবং ৯ মে সিকিমের নাকুলা অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত লাদাখের গালওয়ান ভ্যালি এবং ডেমচক অঞ্চলে চীন তার বাহিনীকে এমনভাবে পরিচালনা করছে তাতে ভারতকেও পালটা ব্যবস্থা হিসেবে সৈন্য সমাবেশ এবং অস্ত্র মজুত করতে হয়েছে। চীন তার পুরোনো অবস্থানে ফিরে না যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আসলে চীন-ভারত সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে কেবল ছোটোখাটো উত্তেজনা বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এমন বিভিন্ন দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ছোটোখাটো দ্বন্দ্বও নতুন কিছু নয়। এগুলো প্রায়শই ঘটে এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে তা মিটেও যায়। কিন্তু ভারত-চীন সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে ছোটোখাটো সীমান্ত দ্বন্দ্বের পর্যায়ে ফেলা অসম্ভব। বরং ১৯৪৯ সালে একটি কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চীন তার প্রতিরক্ষা ও ভূ-কৌশলগত নীতিতে নিজেদের সীমানা এবং প্রভাবের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের যে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই ধারবাহিক প্রক্রিয়ারই অংশ হলো বর্তমান ঘটনা। ২০১৬ সালে জুলাই মাসে হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালত দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর চীনের একচেটিয়া অধিকারের দাবি খারিজ করে দিলেও চীন সেই অঞ্চলের ওপর তার দাবি থেকে সরে আসেনি, বরং সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে তার আগ্রাসী কার্যকলাপ অনেকটাই বেড়েছে। চীন কখনো তার প্রতিরক্ষা ও ভূ-কৌশলগত নীতিতে শক্তি প্রয়োগকে বাদ দিয়ে চলেনি। বরং যখনই তার মনে হয়েছে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে চীন সেটাই করেছে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট সরকার

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে চীন তিব্বতের ওপর হামলা চালায় এবং গোটা তিব্বত দখল করে নেয়। ১৯৬২ সালে পঞ্চশীল নীতি ভঙ্গ করে চীন ভারতের লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশের ওপর আক্রমণ চালায় এবং আকসাই চীন অঞ্চল যা পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর এবং বর্তমান লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার ৩৭৪৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে নেয়। ১৯৭৯ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চে চীন ভিয়েতনামের ওপর হামলা চালায়। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে চীনা সেনা চাইনিজ পিপলস্ ভলেন্টিয়ার আর্মির নামে কোরিয়া যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। ১৯৭৯ সালের পর কোনো বড়ো সংঘর্ষে নিজেকে না জড়ালেও যুদ্ধের হুমকি, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ, সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি চীনের প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতির এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে। চীন তার নিজের ব্যাখ্যা করা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে শক্তি প্রয়োগ করতে পিছুপা হয় না। শক্তি প্রয়োগের হুমকি প্রায় সব সময়েই থাকে চীনের নীতিতে। উহান করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বব্যাপী আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট দেখা দিলেও (বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এর জন্য চীনের দিকেই আঙুল তুলছে) চীন কেবল দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলেই নয়, তার বাইরেও শক্তিপ্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী সব দেশের আপত্তি উপেক্ষা করে চীন দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলের স্পার্টলি ও প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জকে তার প্রশাসনিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। ভিয়েতনাম বা ফিলিপিনস কূটনৈতিক উপায়ে চীনের কার্যকলাপকে চ্যালেঞ্জ করলেও চীন তাকে গুরুত্ব দেয়নি। কোভিড-১৯ হোক বা না হোক চীনের দীর্ঘময়াদি কৌশলগত লক্ষ্য হলো চীন সাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই অঞ্চলের সমস্ত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপগুলির ওপর ধীরে ধীরে থাবা বসিয়ে চীন তার সামরিক অবস্থানকে মজবুত করার দিকে এগোচ্ছে। তবে শুধু দক্ষিণ চীন সাগর নয়, চীনের আগ্রাসী সামরিক কার্যকলাপে তাইওয়ান, জাপান, এমনকী দক্ষিণ কোরিয়াও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। চীনের একটি এয়ার ব্রাস্ট ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ তাইওয়ান ও জাপানের কাছ দিয়েই মহড়া চালিয়েছে। তাইওয়ানের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগ অভিযোগ করেছে, চীন দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে একটি এয়ার ডিফেন্স আইডেনটিফিকেশন জোন স্থাপন করতে চাইছে। এ বছর এখনো পর্যন্ত ছ'বার চীনের যুদ্ধবিমান তাইওয়ানের খুব কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছে। ফলে তাইওয়ানের নিরাপত্তার পক্ষে এক মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ চীন তাওয়ানকে স্বাধীন দেশ বলে মানে না। তাইওয়ানের 'রেনিগেড প্রভিন্স' আখ্যা দিয়ে তাকে মূল চীনের অঙ্গীভূত করাকে (প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে) চীন তার জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করে। এ বছর মার্চ মাসে ওয়াইনাইন সাবভিল্যান্স এয়ারব্রাস্ট দক্ষিণ কোরিার এয়ার ডিফেন্স আইডেনটিফিকেশন জোনকে একাধিকবার লঙ্ঘন করার কারণে দক্ষিণ কোরিয়া তাদের ফাইটার জেটগুলিকে চরম সতর্কতামূলক অবস্থানে প্রস্তুত রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরগুলোতে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় চীনের কার্যকলাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, এই অঞ্চলে চীনা পিপলস লিবারেশান আর্মি এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি জিইয়ে রাখাকে এক সামরিক কৌশলগত নীতি হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলো চীন সম্পর্কে কখনোই দৃঢ় নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৫০ সালে চীন তার সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে তিব্বত দখল করে নেয়। ভারতের তৎকালীন সরকার অদ্ভুতভাবে তা মেনে নেয়। চীনের তিব্বত দখল যে সামরিক-কৌশলগত দিক দিয়ে ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল নেহরু তা বুঝতে চাননি। ১৯৫০ সালে ভারতের সামনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার সুযোগ থাকলেও নেহরু চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার অজুহাতে তা গ্রহণ করতে চাননি। কমিউনিস্ট চীনের উত্থান এবং তার আগ্রাসী মনোভাবে আশঙ্কিত আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমি দেশগুলি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতকেই চাইছিল। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ কেবল এদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে সুউচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতো না, এ দেশকে গোটা এশিয়ার সামরিক ও ভূ-কৌশলগত ক্ষেত্রে এক অনন্যস্থানে অধিষ্ঠিত করতো। কিছু জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির নেতা হওয়ার স্বপ্নে মশগুল নেহরুর কাছে এদেশের জাতীয় স্বার্থ কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৫৪ সালে ভারত ও চীন পঞ্চশীল নীতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। পঞ্চশীলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল পরস্পরের ভূখণ্ডগত ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌমিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। কিন্তু এর ঠিক আট বছর পরেই ১৯৬২ সালে চীন পঞ্চশীল নীতির উল্লঙ্ঘন করে জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ এলাকা এবং অরুণাচল প্রদেশের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় প্রস্তুতিহীন ভারতকে দেখতে হয়েছিল এদেশের ৩৭২৪৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা বিশিষ্ট আকসাই চীন চীনের দখলে চলে গেল। ১৯৬৩ সালে চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ৫০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে চীনকে দান করে দেয়। আকসাই চীন এলাকা ভারতের হাতছাড়া হওয়ার পর প্রবল সমালোচনায় বিদ্ধ নেহরু বলেছিলেন, 'আকসাই চীনে একটা ঘাসও জন্মায় না।' অথচ সামরিক কৌশলগত বিষয় নিয়ে সামান্য জ্ঞান আছে এমন যে কোনো মানুষই বলবে যে আকসাই চীনের দখল চীনকে কৌশলগতভাবে কতখানি এগিয়ে রেখেছে।

চীন মনে করে এশীয় মহাদেশে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা ভারত। ফলে মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও চীনের নীতি হলো ভারতে কৌশলগতভাবে ঘিরে ফেলা। যে দেশের সঙ্গে ভারতের শত্রুতা, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় করে ভারতকে চাপে

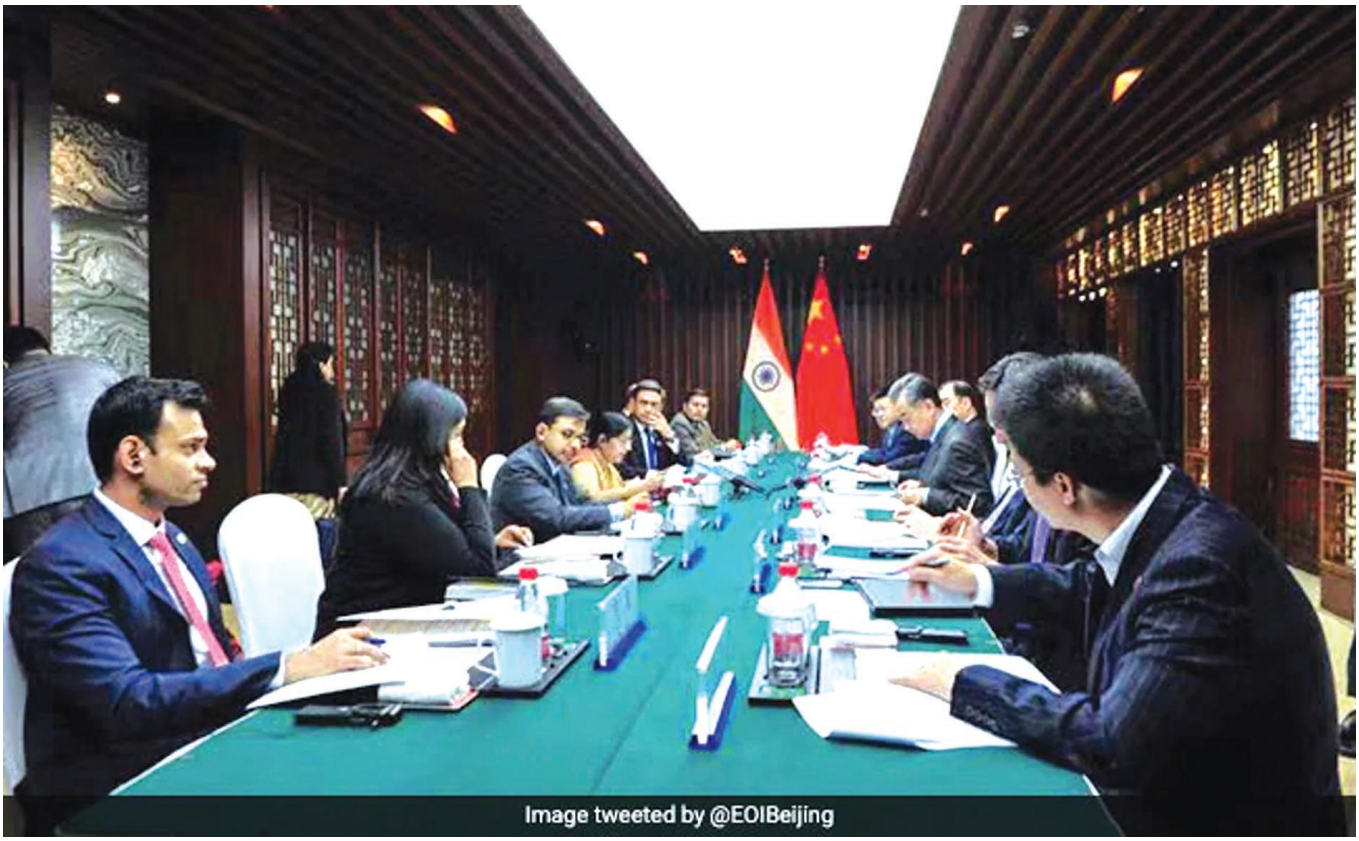
Image tweeted by @EOIBeijing

রাখা (যেমন পাকিস্তান)। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারত-বিরোধী মনোভাব তৈরি করা যেমন বার্মা (মিয়ানমার), শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ। প্রতিবেশী দেশগুলির কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সামরিক বা বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চালিয়ে ভারতকে চাপে রাখা (যেমন বার্মার কোকো দ্বীপে চীনের উপস্থিতি শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা বন্দরে চীনের কার্যকলাপ)। এই সবই করা হয় এই লক্ষ্যে যাতে ভারত আঞ্চলিক রাজনীতিতেই আটকে যায়, একটি এশীয় বা বিশ্বশক্তি হিসেবে তার উত্থান না ঘটে।

বার্টিল লিনটার তাঁর বই 'চায়নাজ ইন্ডিয়া ওয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে ১৯৬২ সালে ভারতের সঙ্গে চীন যুদ্ধ বাঁধিয়েছিল। কারণ চীনের অভ্যন্তরে গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড কর্মসূচি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। সেখান থেকে দৃষ্টি সরাতেই ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে চীন। ২০২০ সালে উহান করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ চীনের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর বড়ো প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। কোভিড-উত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় চীন থেকে বিভিন্ন দেশ যদি তাদের বিনিয়োগ সরিয়ে আনতে থাকে তবে চীনের উন্নয়ন মডেল একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিশ্বে বিভিন্ন দেশ বিশেষত উন্নত দেশগুলি বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য চীনের কাছে জবাব চাইতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বজনমতের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে কি ভারত সীমান্তে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক কার্যকলাপ বাড়িয়ে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করছে চীন? ভারত যাতে আমেরিকা-সহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে একযোগে চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে সেই কারণে কি ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল? এই যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে চীনকে মনে রাখতে হবে, এটা ১৯৬২ সাল নয়। আর দেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে নেই। ভারত সীমান্তে চীন যখন তার সামরিক পরিকাঠামো মজবুত করছিল এদেশের একের পর এক সরকার তখন চুপ করে ছিল। চীনের বিরুদ্ধে পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রথম উদ্যোগ নেয় অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার চীন সীমান্তে ব্যাপক পরিকাঠামো উন্নয়ন করে চলেছে। লাদাখে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত লাদাখের দৌলতবেগ ওলডি অঞ্চলে সেনা ও বিমান নিয়ে যেতে পেরেছে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী জি-সেভেন দেশগুলির গোষ্ঠীতে ভারতের সদস্যপদ পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তাই ১৯৬২-র মতো অ্যাডভেঞ্চার নিতে গেলে বিপদে পড়বে চীনই। কারণ বর্তমান ভারত এক নতুন ভারত। এই ভারত অনেক শক্তি ধরে। বিশ্বও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ■

রবীন্দ্রনাথের পর এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য উদ্ধত নোবেলের

বাসুদেব ধর

ভারতের টেলিভিশন চ্যানেল জি বাংলার সারেগা পা খ্যাত মাইনুল আহসান নোবেল গত বছর অনুষ্ঠানের গ্রান্ড ফিনালের আগে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করার কথা বলেছিলেন। নোবেলের প্রকাশ্য যুক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথ ভারতের নাগরিক এবং রবীন্দ্রনাথের চাইতেও অনেক ভালো গান বাংলাদেশের কবি- গীতিকাররা লিখেছেন। বাংলাদেশি কারও গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হলে ভালো হতো।

নোবেল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি। তিনি সম্ভবত ইতিহাসটা জানেন না। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পথ পেরিয়ে ষাটের দশকে স্বাধিকার আন্দোলন যখন তুঙ্গে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথের এই গানটি সামনে নিয়ে আসেন। গোটা পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব অন্তত ১৮ বার কারাবরণ করেন। কারাগারে যাওয়ার সময় প্রত্যেকবারই তাঁর সঙ্গী হতো সঞ্চয়িতা। আটষট্টি সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিব কারারুদ্ধ হন এবং সামরিক আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার শুরু হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল, শেখ মুজিব পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গোপনে আগরতলা গিয়ে ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ঊনসত্তর সালে তীব্র গণআন্দোলনে সারাদেশ অচল হয়ে গেলে সামরিক শাসকরা মামলা তুলে নিয়ে মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেই আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইউব খানকে পদত্যাগ করতে হয়। পাকিস্তানের মঞ্চে আসেন আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান। শেখ মুজিব ঢাকা

রবীন্দ্রনাথের গানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে পার পেয়ে যাওয়ায় নোবেলের সাহস বেড়ে যায়।... আর যিনি দেশের জাতীয় সংগীত বদল করার কথা বলতে পারেন, তার পক্ষে দেশের কিংবদন্তিদের নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলাটা কোনো বিষয়ই নয়।

কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে কারাগার গেটে সমবেত হাজার হাজার জনতাকে হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়ে গেয়ে ওঠেন, 'আমার সোনার বাংলা...'। সেদিনই নিশ্চিত হয়ে যায় দেশ স্বাধীন হলে নতুন দেশের জাতীয় সংগীত কী হবে।

নোবেলের মন্তব্যের পর বাংলাদেশে তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল। তখন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, নোবেলের এই মন্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রসূত নোবেল জানেন না, পাকিস্তানে ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি বলে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গণআন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানের সামরিক সরকার। নোবেলের কণ্ঠে এখন পাকিস্তানি শাসকদের কথা শোনা যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, জি বাংলা কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি গর্হিত মনে হয়নি। কলকাতায়ও কোনো প্রতিবাদ হয়নি। নোবেলের যাত্রা অব্যাহত থাকে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে পার পেয়ে যাওয়ায় নোবেলের সাহস বেড়ে যায়। এবার মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ত্রিপুরায়। এখন ভারতে যাওয়ামাত্রই গ্রেপ্তার হবেন। মামলা হওয়ার পর থেকে তাকে খুঁজছে ত্রিপুরার পুলিশ। ২৫ মে ত্রিপুরার বিলোনিয়া থানায় নোবেলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। কয়েকটি সূত্র নোবেলের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এদিকে ঢাকায় মামলার বিষয়টি অবগত আছেন বলে জানিয়েছেন নোবেলও। বুধবার রাতে নোবেল বলেন, মামলা হয়েছে, শুনেছি। আমি আপাতত নতুন গানের মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। পরে এটা নিয়ে ভাবব।

আগরতলা থেকে খবর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে ফেসবুকে নেতিবাচক মন্তব্য করায় নোবেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ত্রিপুরার বিলোনিয়ার সুমন পাল। স্থানীয় বিলোনিয়া থানায় নোবেলের

বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলাটি করা হয়েছে। জানা গেছে, নোবেলের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের একটি করে প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের কাছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ভারতে ঢোকামাত্রই গ্রেপ্তার হবেন নোবেল। তাকে ত্রিপুরা পুলিশ খুঁজছে।

যোগাযোগ করা হলে আগরতলা থেকে সহকারী হাইকমিশনার কিরীটি চাকমা বলেন, মামলার বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। এখানকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নোবেলের মামলার খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, সুমন পাল অভিযোগপত্রে তার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মন্দ মন্তব্য করায় নোবেলের ভারতের ভিসা বাতিল এবং তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানিয়েছেন। সুমন পাল সংবাদমাধ্যমে জানান, একজন ভারতীয় হিসেবে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য মেনে নিতে পারেননি, তাই নোবেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এ ছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার জন্য নোবেলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

জি বাংলার খ্যাতির কারণে প্রচণ্ড অহংকারে স্ফীত নোবেল গত বছর এও বলেছিলেন, বাংলাদেশে তার কাজ করার মতো কোনো সংগীত পরিচালক নেই। এমনকী তার সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গান গাওয়ার যোগ্যতা দেশের কোনো নারীশিল্পী রাখেন না। ভারতের জি বাংলার সারেগামাপা অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পর নোবেল ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি 'সুনন্দ' শিরোনামে একটি গান প্রকাশ করবেন। সেটির খবর না দিতে পারলেও 'তামাশা' প্রচারণা করতে গিয়ে সমালোচনার শিকার হন নোবেল। গানের প্রচারের কৌশল হিসেবে দেশের সংগীতের কিংবদন্তিদের নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করে ১৯ মে বিতর্কে জড়ান। নিজের ফেসবুক পেজে নোবেল বলেছেন, 'লিজেন্ডদের আমি শেখাব কীভাবে ২০২০ সালে মিউজিক করতে হয়।' ভারতের জি বাংলার কারণে পরিচিতি পাওয়ার পর বিতর্কের জন্ম দেওয়া নোবেলের এ ধরনের কথা শুনে দেশের সংগীতাঙ্গনের অনেকেই অবাক ও বিস্মিত হয়েছেন। অনেকে এটাকে প্রলাপও বলছেন। হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়াই নোবেলের মুখ থেকে এমন কথা শুনে শুরুতে কেউ বিশ্বাস করতে চাননি। ভেবেছিলেন, হয়তো ফেসবুক পেজ হ্যাক করে কেউ লিখে দিয়েছেন। তাই পিজেন্ডদের নিয়ে এভাবে লিখেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যিনি দেশের জাতীয় সংগীত বদল করার কথা বলতে পারেন, তার পক্ষে দেশের কিংবদন্তিদের নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলাটা কোনো বিষয়ই নয়। পোস্ট দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ফেসবুক লাইভে আসেন নোবেল। তখন সবাই নিশ্চিত হয়ে যান, জেনে-বুঝে পোস্টটি দিয়েছেন। লাইভে তিনি বলেছেন, 'অ্যা ভাই, কী শুনলাম আমি। পেজ নাকি হ্যাক হয়েছে। কই পেজ তো হ্যাক হয়নি। আমি তো নোবেল। দেখেন রক্ত-মাংসের নোবেল। গাল টানলে গাল বাড়ে, নাক ধরা যায়। আমি নোবেল। সো নো প্রবলেম।'

এদিকে গান নিয়ে সমালোচনার রেশ কাটতে না কাটতে ইদের পরই সাত মাস আগে সেরে নেওয়া বিয়ের খবরটি প্রকাশ্যে চলে আসে। ফেসবুক-সহ নানা মাধ্যমে এটি নোবেলের তৃতীয় বিয়ে হিসেবে চাউর হতে থাকে। সংবাদমাধ্যমের কাছে নোবেল দাবি করেছেন, তৃতীয় বিয়ের ব্যাপারটি পুরোটাই মিথ্যা। ২৬ মে তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে এর আগে কোনো মেয়ের বিয়ে হয়নি। তবে আমার সঙ্গে অনেক মেয়ের সম্পর্ক ছিল। এত মেয়ের সম্পর্ক ছিল যে গুনে শেষ করা যাবে না। এ অবস্থায় এখন যদি বলা হয় এটি আমার তৃতীয় বিয়ে, এটি ঠিক না। তৃতীয় বিয়ের খবরটি গুজব, বিভ্রান্তিকর।'

গোপালগঞ্জের ছেলে নোবেল বড়ো হয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। লেখাপড়া করেছেন বাংলাদেশ ও ভারতে। গান নিয়ে মেতে ওঠেন কলকাতায় থাকতেই। মাত্র ৬০০ টাকায় পুরোনো সিগনেচার ব্যান্ডের গিটার কিনে তা দিয়েই শুরু করেন সংগীতচর্চা। কলকাতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে ২০১৪ সালে ঢাকায় ফেরেন নোবেল। এভাবে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা করতে করতে জি বাংলায় স্থান করে নেন এবং ঔদ্ধত্যের শিখরে পৌঁছে যান।

ভারতের পুনর্গঠনে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ সময়োপযোগী ও সঠিক পদক্ষেপ

করোনা পরিস্থিতিতে চীনের ওপর আস্থা হারানো বিনিয়োগকারীরাও যাতে ভারতকে ব্যবসার গন্তব্যস্থল মনে করে, তারজন্য সংস্কারকে অঙ্গীভূত করে এই বিশাল আর্থিক প্যাকেজ। সুতরাং ভারতের পুনর্গঠনে এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনে এই প্যাকেজ সময়োপযোগী ও সঠিক।

কে. এন. মণ্ডল

করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বিশ্বে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, লাগাতার লকডাউনে আতঙ্কিত বিশ্ব অর্থনীতি গভীর মন্দার মুখোমুখি। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (WHO) একমত যে, করোনা সংক্রমণ কমলেও এর জুতসই প্রতিষেধক যতদিন না আসছে ততদিন করোনার সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হবে। অতএব রাষ্ট্রনায়করা একমত যে, লাকডাউন পর্যায়ক্রমে তুলে দিয়ে আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও চালিয়ে যেতে হবে। তা না হলে অর্থনীতির মুখ থুবরে পড়বে। মন্দাক্রান্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশ ইতিমধ্যেই আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। জাপান সে দেশের জিডিপি-র (Gross Demestic Product) ২১%, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৩%, ভারতবর্ষ ১০% এবং চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক Peoples Bank of China সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে US $ 115 billion ঋণের জোগান দেওয়ার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ মে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেছেন ভারতের অর্থনীতিকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করাতে, যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক। ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সিতারমন এই আর্থিক প্যাকেজের যে রূপরেখা বিবৃত করেছেন তা নিম্নরূপ—

(১) প্যাকেজের মোট আর্থিক সংস্থান দাঁড়াবে ২০,৯৭,০৫৩ কোটি।

(২) ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণ দিতে ৩ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল গঠন।

(৩) চাষিদের ঋণ দিতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

(৪) হকারদের ঋণ দিতে ৫ হাজার কোটি টাকা।

(৫) কৃষি পরিকাঠামো তৈরীতে ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ।

(৬) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের যোগান।

(৭) P.D.S (Public Distribution System) এর মাধ্যমে ৭৫ কোটি মানুষকে ৬ মাস ধরে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রি বণ্টন। মাথাপিছু ৫ কোজি চাল এবং ১ কেজি ডাল একবারেই তোলা যাবে।

(৮) ৮০০ হেক্টর জমিতে ঔষধি ভেষজ চাষের ব্যবস্থা।

(৯) ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে হারবাল উদ্ভিদ চাষে ১ হাজার কোটি টাকা।

(১০) দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ।

(১১) প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সমবায় যোজনায় ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ।

(১২) ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা।

(১৩) লকডাউনের জন্য কৃষিপণ্যে সহায়ক মূল্য দিতে ৭৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

(১৪) প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের জন্য ১৮ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

(১৫) বাজেট বরাদ্দ ৬১৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৪০ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজে শামিল।

(১৬) কৃষির উন্নয়নে ১ লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামো তহবিল।

(১৭) ২০২০–২১ অর্থবর্ষে শর্তাধীনে বাজেট ঘাটতি ৩% থেকে ৫% করার অধিকার রাজ্যের। এতে রাজ্যগুলির হাতে অতিরিক্ত ৪.২৮ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১.০৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনাশর্তে।

(১৮) মহিলাদের জনধন প্রকল্পে মাসিক ৫০০ টাকা এবং উজ্জলা প্রকল্পে ৩টি বিনা পয়সায় গ্যাস সিলিন্ডার বরাদ্দ। উপভোক্তাদের মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদেরও অনেকে আছেন।

এই ত্রাণ প্যাকেজকে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের প্রকল্প হিসেবে দেখার কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। তাঁর মতে এই প্যাকেজ স্বল্পকালীন আর্থিক সংকটের বাইরে, ভবিষ্যতে বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থায় ভারতকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাবে। এই প্যাকেজের সমালোচকদের মতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার যে কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে মাত্র ২,১৭,০৯৫ কোটি টাকা আসবে সরকারি তহবিল থেকে। বাকি টাকা অতীতে ঘোষিত বাজেট বরাদ্দ। শিল্পে ঘোষিত নানা ধরনের কর ছাড় এবং এনবিএফসি-তে অর্থ জোগান সহ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ যোগানের মাধ্যমে আসবে। যা এই মুহূর্তে সংকটাপন্ন মানুষের কাজে আসবে না। পরিয়াযায়ী শ্রমিক এবং কাজ হারানো মানুষকে হাতে নগদ দিয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে সচল করতে হবে। এই মতের সমর্থক অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুৎপাদক ক্ষেত্রে অর্থ বিলানোর জন্য যদি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তবুও। সরকারি তহবিলের টাকা আর ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, টাকাটা কোথা থেকে এসেছে এ প্রশ্ন না তুলে দেখুন টাকাটা কোথায় যাচ্ছে। অর্থাৎ এযেন বিড়ালের রং নিয়ে প্রশ্ন তোলার মত। মূল ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টরগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের অর্থযোগানের ব্যবস্থা করা। নগদ পাইয়ে দেওয়া নয়, কারণ এভাবে অর্থনীতির পুনর্গঠন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রকল্পে যেমন মানুষ যাতে পুনরায় কাজে ফিরতে পারেন তার জন্য পরিকাঠামো তৈরির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে আগ্রহীদের উৎসাহিত করার প্যাকেজ রয়েছে। আবার দীর্ঘদিন লকডাউনে কাজ হারানোদের রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্নের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে উপকৃত হচ্ছেন ৭৫ কোটি মানুষ। তবে ছোট-মাঝিরি শিল্পোদ্যোগ ছাড়াও ছোটো-ছোটো দোকানদার যাদের সংখ্যাও সারা দেশে কোটি কোটি, তাদের কিন্তু এই প্যাকেজে পাওয়ার কিছু নেই। যেমন নেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভবিষ্যতে কাজে যোগ দেওয়ার গ্যারান্টি। এই প্রতিবেদকের মতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ-নিজ রাজ্যে না ফিরিয়ে কর্মস্থলে রেশনের ব্যবস্থা করে, স্থানান্তরের সুযোগ না দেওয়া। এর ফলে করোনা সংক্রমণের সম্ভবনা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি করোনামুক্ত পরিস্থিতিতে কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাবে উন্নয়ন এবং উৎপাদন মার খাবে। রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পরিযায়ীদের স্ব-স্ব স্থানে রেখে তাদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে কেন্দ্র এত সমালোচনার মুখে পড়ত না।

কেন্দ্র কেন করোনামুখী নগদ বিলির পরিবর্তে এই সংকটকালে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তার শামিল তার উত্তর খুঁজতে বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের অনেকের অভিমত স্মতর্ব্য। তাঁদের মতে সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এইটাই উপযুক্ত সময়। এমনকী, জাতিসঙ্ঘের অর্থ বিষয়ক সংস্থা WESP (World Economic Situation Prospect)-এর তরফে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বিশাল আর্থিক প্যাকেজ ভারতের অর্থনীতিকে মজবুত করবে। তবে তারাও কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের হাতে টাকা না এলে এবং ভোগ্যপণ্যে খরচ না বাড়লে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে না, তাতে যদি Demand Pull inflation হয় হোক। অর্থাৎ Keynesion অর্থনীতির মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি উৎপাদন না বাড়ে, তা হলে তো মুদ্রাস্ফীতি সহ্যসীমার বাইরে গিয়ে stagflation বা অতি মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করবে। যতক্ষন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের সামঞ্জস্য থাকে এবং বেতন বৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কুচিত না হয় ততক্ষণ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির পক্ষে লাভজনক। কিন্তু staflation এর মতো পরিস্থিতিতে ক্রয়ক্ষমতা কমে মন্দাজনিত সমস্যা দেখা দেবে। ফিরে আসবে অর্থনীতিতে Recession-এর প্রভাব। ফলে হ্রাস পাবে রপ্তানি। টাকার মূল্য কমে যাবে, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বাড়বে, ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশ্ব-রেটিং নিম্নগামী হবে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা হারাবে ভারত।

আর এখানেই প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজের বিশেষত্ব। কৃষি থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সংস্কারের অঙ্গীভূত করে অর্থযোগানের প্রস্তাব রয়েছে এই প্যাকেজে। ছোট, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, NBFC-তে অর্থজোগান, আবাসন ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সংস্কার ও দায়বদ্ধতা, কর্মসংস্থানের ভাবনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নতুন কৃষিপণ্য আইন, বিমান ও কয়লাক্ষেত্রে সংস্কার এবং বিলগ্নীকরণ সহ বহু সংস্কারের প্রস্তাব রয়েছে এই প্যাকেজে, যার সফল রূপায়ণ হলে ভারতের অর্থনীতি শুধু ঘুরে দাঁড়াবে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বে ভারত আর্থিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তাই বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বাণিজ্যসংস্থা এই প্যাকেজকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজে উৎপাদনের ৪টি মূল উপাদান, যেমন—জমি, শ্রম, অর্থ এবং আইনে সংস্কারের প্রস্তাব রয়েছে। সরকার মনে করে ব্যবসা করবেন ব্যাবসায়ীরা, সরকার তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শুধুমাত্র কল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করবে। তাই করোনা সংকটের মধ্যে এই বিপর্যয়কে ভবিষ্যতের সুযোগে পরিণত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকার। করোনা পরিস্থিতিতে চীনের ওপর আস্থা হারানো বিনিয়োগকারীরাও যাতে ভারতকে ব্যবসার গন্তব্যস্থল মনে করে, তারজন্য সংস্কারকে অঙ্গীভূত করে এই বিশাল আর্থিক প্যাকেজ। সুতরাং ভারতের পুনর্গঠনে এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনে এই প্যাকেজ সময়োপযোগী ও সঠিক। অবশ্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের End use (খরচের হিসাব) সার্টিফিকেট চাইলে যাঁরা কেন্দ্রের দাদাগিরির অভিযোগ তোলেন নগদ না পেলে তাঁদের হতাশা তো থাকবেই।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

হালাল সার্টিফিকেশন
ইসলামের অর্থনৈতিক জেহাদ

ডাঃ আর এন দাস

হালাল সার্টিফিকেটের ব্যাপারে অনেকদিন ধরেই শুনে আসছিলাম। তার সত্যতা সম্পর্ক কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর অহিংসার পূজারি ঋষভদেবকে হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে মানা হয়। জৈনরা সংখ্যালঘু হলেও ভারতে তথা আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী। বিশ্ব জৈন সংগঠন নামের বেসরকারি সংস্থার আইনজীবী রবিপ্রকাশ গুপ্তা ২০ এপ্রিল, ২০২০ তে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে পিআইএলের দ্বারা জনহিতকারী এক মামলা দায়ের করে ভারতে তথা বিভিন্ন রাজ্যে ইসলামিক 'হালাল' পদ্ধতির সাহায্যে পশুহত্যা এবং মাংস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা লাগানোর জন্য আবেদন করেছেন। আরবিতে 'হালাল' মানে অনুমোদিত অর্থাৎ আইনসিদ্ধ, আর 'হারাম' মানে প্রতিবন্ধিত বা বেআইনি। বিশেষ করে খাদ্য বিষয়েই হালাল শব্দটি বহুল প্রচলিত। 'শরিয়া' আইন মেনে যেসব খাদ্য কোরানে নির্দিষ্ট হয়েছে তা একজন মুমিনের জন্য বিহিত বা গ্রহণযোগ্য। অন্য সমস্ত কিছুই বর্জিত। তাদের বলে হারাম। মদ, মরা পশু বা শুয়োরের মাংস, রক্ত বা রক্তের উপজাত সামগ্রী রক্তাল্পতায় বা সার্জারির সময় প্রাণদায়ী ব্লাড ট্রান্সফিউশনে কিন্তু তাদের কোনো আপত্তি থাকে না। ওষুধের দোকানে বা ফ্যাক্টরিতে রক্ত পাওয়া যায় না। ভারতে হিন্দুরাই রক্তদান করে আর অন্যেরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। ইহুদি ও হিন্দুরা মুসলমানদের জাতশত্রু। সুতরাং শত্রুর সামগ্রী অবশ্য বর্জনীয়। অথচ এই দুই শত্রুর তৈরি প্রাণদায়ী বস্তুসমূহ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য। হিন্দুশাস্ত্রে যা কিছু বর্জনীয় ও বিপরীত, তাই হচ্ছে মুসলমানদের কাছে স্বীকার্য ও ধার্য। হালাল প্রক্রিয়াতে শরিয়া আইন অনুসারে, 'বিসমিল্লা রহমানের্রহিম' বলে নির্বল পশু যেমন গোরু, ভেড়া, ছাগল, উট ইত্যাদি জন্তুকে যাতনা দিয়ে, ধারালো ছুরি দিয়ে শ্বাসনালী ও গলার জুগুলার ভেনে বসিয়ে ধীরগতিতে সম্পূর্ণ রক্তশূন্য করে মারা হয়। মক্কার দিকে মাথা রেখে, সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায়, দেহ থেকে মাথা আলাদা না করে এবং কোরানের আয়াত শোনানোর পর নির্জীব সেই আধমরা পশুর ছালচামড়া ছাড়িয়ে ও কেটে মাংস বিক্রি করা হয়। এই হলো হালাল মাংস। ইদগাহে উপস্থিত শিশুদের শেখান হয় পশু জবাইয়ের পদ্ধতি। মুসলমান খুনিরা ঠিক তেমনি ভাবেই কাফেরদের গলা রেত করে। ইংল্যান্ডের রদারহামে ২২ থেকে ৫৮ বছরের পাকিস্থানি মুসলমানরা শ্বেতাঙ্গিনী অনাথ শিশুকন্যাদের গণধর্ষণ করার সময়ও কোরানের আয়াত আবৃত্তি করে তাদের লালসা নিবৃত্ত করে বলে জানা গেছে!

অন্য আব্রাহামিক মত-পথগুলো হচ্ছে ইহুদি ও খ্রিস্টান । তারাও কিন্তু অনেকটা একই পদ্ধতিতে পশুহত্যা করে। তাদের তৈরি মাংসকে বলা হয় কোশার। অবশ্য তারা পশুকে হত্যার পূর্বে বিভিন্ন উপায়ে যেমন মাথার নীচের মেরুদণ্ডের মেডুলাতে পিন ঢুকিয়ে বা ইলেকট্রিক শক দিয়ে অজ্ঞান করে তবে পশুহত্যা করে। হিন্দুরা পাঁঠা কাটে ঝটকা দিয়ে। বিশাল ধারালো খড়্গের এক কোপে ধর থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়। আজকের জটিল জনজীবনে খাওয়াদাওয়া আর আগের মতো মা-ঠাকুমাদের হাতে তৈরি হয় না। এখন প্রতিটি পাড়ায় আর সমস্ত রাস্তায় রেস্টুরেন্ট, নামকরা হোটেল-মোটেলের ছড়াছড়ি। মহিলাদের তুলনায় পুরুষরাই সেসব রান্নাঘরের বিখ্যাত সব সেফ বা বার্বুচি। আমরা জন্মদিন, বিয়ে, পৈতে এমনকী শ্রাদ্ধবাড়িতেও খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে থাকি। আজ আর পায়েস বা রসগোল্লায় মন ভরে না। আজ খাদ্য তালিকায় থাকা চাই আইসক্রিম, চপকাটেলেট এবং সর্বোপরি মদিরাসেবন। আজকের খাদ্য তালিকার খবর রাখে বালক থেকে বৃদ্ধ সবাই। সকলেই খোঁজে প্রোটিন, ভিটামিন,আন্টিঅক্সিডেন্ট, গ্লিসারিন, জিলাটিন আর ফ্যাটি অ্যাসিড। পাচকরা খোঁজে সস্তার পশুমাংস, রঙ্গিন খাদ্য, এনজাইম আর সুগন্ধিকরার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর । কিন্তু কে কার কথা শোনে! উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মেটানিল ইয়োলো যা হলুদের রংকে তীব্র করে দেয় বা মিট-মশলায় ব্যবহৃত সোডিয়াম গ্লুটামেট—যা দীর্ঘদিনের ব্যবহারে মাইগ্রেন ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। এমনকী যকৃতের ক্যানসার পর্যন্ত করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমরা যেসব তেল ব্যবহার করি তাতে চর্বি মেশানো থাকে। সেই চর্বির উৎস হচ্ছে কসাইখানার শুয়োর বা গোরু। এতদিন আমাদের দেশে খাদ্যের প্যাকেটের উপর এই হালালের চিহ্ন দেখা যেত না, কিন্তু ইদানীং ইসলামিক জিহাদের অঙ্গ

ইসলামের এই অর্থনৈতিক জিহাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে সজাগ হতে হবে। হালাল সার্টিফিকেটের ব্যবহার রদ করতে হবে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা চালু করলে একদিন সমস্ত ভারতে শরিয়া আইন চালু হবে।

ভারতে অনেক ইসলামিক সংস্থা আছে যেমন 'হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড', 'হালাল সার্টিফিকেশন সার্ভিসেস অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড', 'হালাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া', 'জামাত উলেমা-ই-মহারাষ্ট্র হালাল ট্রাস্ট', 'জামাত-উলেমা-ই-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট'—এরকম ১২টি সংস্থা বেআইনিভাবে দেশে শরিয়া আইন চালু রেখেছে।

হিসাবে 'ওদের আর আমাদের' নীতির দ্বারা বিভেদ সৃষ্টি করে দেশকে আবার বিভাজিত বা ইসলামিকরণের চক্রান্তের পরিকল্পনায় হালাল সার্টিফিকেটের লোগো দেখা যাচ্ছে। এবারের বিভাজন মানে কিন্তু হিন্দুশূন্য ভারত। দিল্লিতে ধৃত শাজিল ইমামের জবানবন্দি থেকেই সেটা জানা গেছে। যেমনভাবে বাংলাদেশ বা পাকিস্থান হিন্দুশূন্য হয়েছে, যেমনভাবে কাশ্মীর ও কেরালা ধীরগতিতে হিন্দুহীন হচ্ছে। মণিপুর, ত্রিপুরা, অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে গ্রেটার বাংলাদেশ গড়ার ষড়যন্ত্রকারীদের বেশিরভাগই কিন্তু হিন্দু নামধারী দেশদ্রোহী। উদাহরণ দিচ্ছি। মধ্যপ্রদেশের উপজাতি অজিত যোগী হিন্দু ছিলেন কিন্তু ইতালীয়ান মাফিয়ার দ্বারা হিন্দু নামটি রেখে ধর্ম পরিবর্তন মেনে নিয়েছিলেন বলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। গোমাংসাশী বিকৃত মস্তিষ্কের বিকাশরঞ্জন কিম্বা মমতা ব্যানার্জি মুসলমানপ্রেমী, কিন্তু নামটি হিন্দু রেখেছেন ভোটের খাতিরে! ম্যাগসাসি পুরস্কার প্রাপ্তা হিন্দুনামের আড়ালে কেরালার কুখ্যাত অরুন্ধতী রায় আর কর্ণাটকের অভিনেতা গিরিশ করনাাড ধর্মান্তরণের পর তীব্র হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। সদ্য পালঘরের ঘটনায় জড়িত প্রদীপ প্রভু ওরফে জেসুইট পাদরি পিটার ডি মেলো ধর্মান্তরিত উপজাতি হিন্দু আজ হিন্দুসাধুর হত্যায় অভিযুক্ত আসামি। যাক সেসব কথা। আমাদের দেশে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্টান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া-ই একমাত্র সরকারি সংস্থা—যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণাবত্তার উপর সিলমোহর ব্যবহার করার অধিকার পায়। কিন্তু হালাল সার্টিফিকেট দেবার কোনো এক্তিয়ার নেই এই সংস্থার। ইসলামিক দেশগুলিতে হালাল সার্টিফিকেট সেসব দেশের খাদ্য সামগ্রীর উপর শুধুমাত্র সরকারি সংস্থাগুলিই দিতে পারে। কিন্তু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে অনেক ইসলামিক সংস্থা আছে যেমন 'হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড', 'হালাল সার্টিফিকেশন সার্ভিসেস অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড', 'হালাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া', 'জামাত উলেমা-ই-মহারাষ্ট্র হালাল ট্রাস্ট', 'জামাত-উলেমা-ই-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট'—এরকম ১২টি সংস্থা বেআইনিভাবে দেশে শরিয়া আইন চালু রেখেছে। এই সংস্থাগুলি অবশ্যই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের অনুমোদনে গড়া হয়েছিল গত ৭৩ বছরের রাজত্বকালে। অর্থাৎ ভারতকে ধীরে ধীরে 'গাজওয়া-ই-হিন্দ' করার সুপরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল। তবুও আমরা ঘুমিয়ে আছি। আজ এই হালাল সার্টিফিকেটের ব্যাপ্তি আমেরিকা ও ইউরোপ-সহ সারা বিশ্ব জুড়েই হয়ে চলেছে। এয়ারপোর্টে, নার্সিং হোমে, হসপিটালে, হোটেল ও শপিং মলেও দেখতে পাওয়া যায় হালাল সার্টিফায়েড দোকান বা দ্রব্য সামগ্রী। এমনকী ওষুধপত্র বা প্রসাধন সামগ্রীতেও হালাল সার্টিফিকেটের সিলমোহর না হলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে পারে! ভারতে ম্যাকডোনাল্ড, জোম্যাটো ও সেঞ্চুরি ফ্রাইড চিকেন মানে কে এফ সি-র সমস্ত শাখাই ভয়ে ভয়ে এই সার্টিফিকেটযুক্ত খাদ্য পরিবেশন করতে বাধ্য হচ্ছে ৩৫ মিলিয়ন মুসলমান খরিদদারের কথা বিবেচনা করে। প্রসাধনী ও ওষুধশিল্পে পশুদেহের প্রোটিন, জিলাটিন ও চর্বির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন অ্যাম্পিসিলিনের ক্যাপসুল, আমারার লিপস্টিক ও বিভিন্ন রকমমুখে ব্যবহৃত ক্রিমে থাকে চর্বি। আগে এই প্রথা ছিল না। এখন মুসলমানদের জন্যই হালাল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর পিছনের কারণ আর কিছুই না অর্থনৈতিক জিহাদ! সারা বিশ্বে ১.৮ বিলিয়ন মুসলমান যা প্রায় মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশের মতো। অর্থাৎ ৫৮ টা ইসলামিক দেশে ব্যবসা চালানো বা রপ্তানি করার জন্যই হালাল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। কে দেয় ওই সার্টিফিকেট? কেন উপরিউক্ত সংস্থাগুলি! তারা কিন্তু আপনাকে এমনি দেবে না ওই সার্টিফিকেট! তার জন্য আপনাকে অনেক বেশি 'সার্টিফিকেট ফি' দিতে হবে। কত? প্রথম বছর ২০,০০০ টাকা। প্রতি বছর পুনরায় নবীকরণ করতে হবে ১৫,০০০ টাকার বিনিময়ে। প্রতিটি দ্রব্যের জন্য আলাদা করে ফি দিতে হবে। প্রতি বছর ওই সমস্ত ইসলামিক সংস্থা লক্ষ কোটি ডলার সংগ্রহ করে হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি কোম্পানি থেকে। জামাত-ই-উলেমা-ই- হিন্দ সেই বিশাল পরিমাণ টাকা দিয়ে কি করে? সেটা ব্যবহার হয় ভারতে ইসলামিক জিহাদের প্রচার, প্রসার ও প্রস্তুতির ব্যয় হিসেবে। প্রতিটি ধর্ষণ, খুন, দাঙ্গায় ধৃত জিহাদি অপরাধীদের কেসের ব্যয়ভার বহন করা, কংগ্রেসের নামি-দামি উকিল, যেমন কপিল সিব্বাল আর অভিষেক মনুসিংভির পারিশ্রমিক বা ফি, হিন্দুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমি-জিহাদ ও লাভ-জিহাদের খরচা—সমস্ত কিছুই আসে সেই উপার্জিত টাকা থেকে। সেই বিশাল পরিমাণ টাকা আদায় হয় ৮০ শতাংশ হিন্দুর পকেট থেকে। সারা পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্যের বাজারে প্রায় ১৯ শতাংশ বিক্রি হয় হালাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে। আর পৃথিবীব্যাপী এই 'হালাল ইন্ডাস্ট্রি'র বাজার মূল্য হচ্ছে ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার যা অবিশ্বাস্য গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বছর। জানেন তো, আই.টি.সি-র তৈরি 'আশীর্বাদ' আটাতে আছে হালাল সার্টিফিকেট। তা না হলে আর আরব দেশগুলিতে বাজার পাবে না অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জিহাদের সঙ্গেই অধুনা যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক জিহাদের এক নতুন সংস্করণ।

আজ জীবনশৈলীর পরিবর্তনের সঙ্গে ইংরেজি জানা তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে পর্যটনটা হয়েছে বিশেষ ধরনের বিলাসিতা। প্রকৃতির অকৃপণ দানে পাওয়া অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডার আর সহজলভ্য অর্থের সদ্ব্যবহার করার জন্য তারা যাচ্ছে বিধর্মী দেশগুলিতে ফুর্তি করতে। সেখানে তাদের জন্য চাই সমস্ত কিছুই, 'হালাল সার্টিফাইড'। তাই পর্যটন শিল্পের মধ্যেও ইদানীং দেখা যাচ্ছে এই হালাল সার্টিফিকেটের অপরিহার্যতা। নেপাল, থাইল্যান্ডের মতো দরিদ্র অনেক দেশের আয় নির্ভর করে ভ্রমণবিলাসীদের মনোরঞ্জন করে। আরবদেশের ধনীরা হালাল সার্টিফাইড রিসর্ট বা হোটেলেই যেতে চান। তাই তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে। মুসলমান কর্মচারী থেকে শুরু খাওয়াদাওয়া ও শোয়ার ব্যবস্থা—সমস্ত কিছুই কোরানে বর্ণিত শরিয়া আইন মেনে হালাল সার্টিফায়েড হতেই হয়। এর জন্য 'হালাল' ছাপ দেওয়া সামগ্রীর দামও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে পড়ে। সব থেকে বড়ো সমস্যা হচ্ছে মাংসের ব্যবসায়ে। শুধুমাত্র মুসলমানদের দ্বারাই পরিচালিত হতে হবে এই ব্যবসা। এই বৈষম্যসূচক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্য আজ সারা বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। সম্প্রতি করোনার আবহে ঝাড়খণ্ডে এক ফলের দোকানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ফেস্টুন লাগান হয়েছিল বলে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং যথারীতি তোষণনীতির প্রয়োগে প্রশাসন দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করে। তৎক্ষণাৎ হিন্দুর সেই ফলের দোকান থেকে ফেস্টুন সরিয়ে দাঙ্গা রোধ করা হয়। ইসলামের এই অর্থনৈতিক জিহাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে সজাগ হতে হবে। হালাল সার্টিফিকেটের ব্যবহার রদ করতে হবে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা চালু করলে একদিন সমস্ত ভারতে শরিয়া আইন চালু হবে যাতে বিধর্মীদের হত্যা ও ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হবে এবং অচিরেই ভারতে গাজওয়া-ই-হিন্দের চক্রান্ত সফল হবে। তাই এখনই সাবধান হতে হবে। ■

ছ' দশকের অকর্মণ্যতাকে ঝেড়ে ফেলে ভারতকে এক আত্মনির্ভর টগবগে দেশ করে তুলেছেন মোদীজী

অতিথি কলম

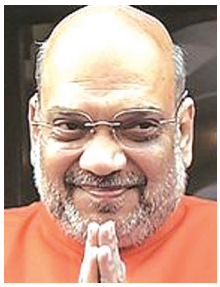

অমিত শাহ

বিগত ছ' বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে ভারতের এক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর যাত্রা শুরু হয়েছে। এই প্রথম দেশের মানুষ ২০১৪-র আগের সময়ের থেমে থাকা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতির জায়গায় নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ সম্পূর্ণ হওয়া প্রত্যক্ষ করল। এর কারণ সুদৃঢ় নেতৃত্ব। একই সঙ্গে দেশের মানুষের বিশ্বাস অর্জন, তাদের সহযোগিতা নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণ হয় যে চলতি মোদী সরকার ৬ দশকের নিষ্কর্মের ফারাক ৬ বছরে ভরাট করে একটি আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের শক্তপোক্ত ভিত তৈরি করেছে।

বিশ্বের ক্ষণভঙ্গুর ৫টি অর্থনীতির আওতা থেকে ভারতকে অন্যতম অগ্রণী অর্থনীতির স্তরে তুলে নিয়ে যাওয়া, সন্ত্রাসবাদের আগ্রাসী কবল থেকে বের করে এর বিরুদ্ধে একটি নির্ণায়ক সফল লড়াই গড়ে তোলা কম কথা নয়। স্বচ্ছতাকে দেশবাসীর জীবনযাত্রার অঙ্গ করে তোলা থেকে গ্রামগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে গরিব কৃষকের জীবনে প্রাচুর্যের মুখ দেখানো কয়েকটি উদাহরণ। দেশবাসী মোদী সরকারের প্রথম দফায় দেখেছে, এই সরকার যে কোনো চ্যালেঞ্জের পরিস্থিতি থেকেই সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। সেইসূত্র ধরেই দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বছরেই মানুষ সরকারের কাজেকর্মে তাদের স্বপ্নপূরণের নিশ্চয়তা দেখতে পাচ্ছে।

বিজেপির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনী ইস্তাহারে থাকা প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতিকে রূপায়িত করেছে ও করছে।

ইস্তাহার যে নিছক কথার কথা নয়, কাজে তার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সরকার গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই আরও মজবুত করল। দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা বহু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যেমন জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করা, বহু প্রতীক্ষিত রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করা তার মধ্যে অন্যতম।

মুসলমান মহিলাদের তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি ও দশকের পর দশক ধরে বঞ্চিত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান স্বাধীনতার পরের ঐতিহাসিক ভুলগুলির সাহসী সংশোধন। কেবলমাত্র বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৫০ কোটি গরিব মানুষ আজ চিকিৎসার খরচ জোটানোর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে কোটি কোটি মহিলা আজ খুশি। বার্ষিক ৬ হাজার টাকা কৃষকদের খাতায় সরাসরি চলে যাওয়া তাদের ক্ষমতায়নেরই প্রমাণ। প্রত্যেক গরিব ভারতীয়র নিজস্ব আবাস ও 'জনধন'-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কে যাওয়ার অধিকার প্রদান সারা ভারতকে জোড়ার পরিকল্পনারই অঙ্গ। এই কাজগুলির মাধ্যমে মোদী সরকার এ যাবৎ অচিন্তনীয় 'কাজের সঙ্গে সংস্কারের' অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। মনে রাখা দরকার, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি সংসদের উভয় সভার সম্মতিক্রমেই পাশ হয়েছে। যদিও রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না।

সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতির ওপর কঠোরতম আঘাত দেশের মধ্যে এক অন্য ধরনের আত্মবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে। নতুন প্রবর্তিত ইউএপিএ এবং এনআইএ আইনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের মুখ ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের সাহসী বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতি দেশকে বিশ্বের প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছে। বাস্তবে সারা বিশ্বে ভারত সম্পর্কে ধারণায় আজ আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। দ্বিতীয় দফায় সরকার প্রথম বছরেই সারা বিশ্বে চলা অর্থনৈতিক মন্দার আবহে অর্থনীতিকে বেগবান করে তুলতে বেশ কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য অসামরিক বিমানক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগে ছাড়পত্র, কোম্পানি করে ছাড়, অনেকগুলি ব্যাঙ্কের একত্রীকরণ,

কোম্পানি আইনের ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে ছোটো ও মাঝারি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির সহজে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

অনাদিকাল থেকে আটকে থাকা বোড়ো জনগোষ্ঠীর সমস্যার ইতিবাচক সমাধান মোদী সরকার-২ এর প্রথম বছরেই হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের তিনটি অংশ স্থল, আকাশ ও নৌবাহিনীর এক মিলিত প্রধান বা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের পদ তৈরি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যা যুগান্ত ধরে অনিশ্চিত ছিল। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হবে (আমদানি কমায়)। কৃষক, শ্রমিক ও ছোটো ছোটো ব্যবসা চালানো নিম্ন ও মধ্যমবর্গের লোকেদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা থেকে 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' প্রথা চালু করা, ফসল ও শস্যের সহায়ক মূল্য দেড়গুণ বৃদ্ধি থেকে নির্দিষ্ট বহু জেলায় বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করার মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয়েছে যে জনহিতকর প্রকল্প সঠিকভাবে চালানোর মাধ্যমেও জিডিপি-র সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটানো যায়। সৌভাগ্য, উজ্জ্বলা বা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রকল্পগুলিও তো এরই অঙ্গ।

দেশে ভয়ংকর করোনা মহামারীর প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে 'লকডাউন' জারি করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এর ফলে কী শিল্প, কী কৃষিক্ষেত্র বা অন্যান্য অর্থনীতি সম্পৃক্ত সকল বিভাগ বিঘ্নিত হয়েছে তা যথাযথ উন্নয়নের পথে ফেরাতে সরকার ২০ লক্ষ কোটি টাকার এক বিশাল বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়েছে। এর পরিণতিতে এক নতুন আত্মনির্ভর ভারত গড়ে ওঠার দিশা দেখা যাচ্ছে। বিগত দু'মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পগুলির আওতায় শ্রমিক, কৃষক, বিধবা, বয়স্ক বা দিব্যাঙ্গদের ব্যাঙ্ক খাতাগুলিতে সরাসরি ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে গেছে। এই অতি মহামারীতে প্রভাবিত গরিব পরিবারগুলিকে বাঁচাতে ৫ মাস বিনামূল্যে রেশন দেওয়া ও তাদের মনরেগা প্রকল্পে বাড়তি কাজ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ৪০ হাজার কোটি টাকা আগাম মজুত রাখা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, মাত্র এপ্রিল মাসের গোড়াতেই 'করোনা ভাইরাসের' মোকাবিলায় প্রথম সারির যোদ্ধাদের উপযোগী পিপিই কিট, এন-৯৫ মাস্ক, ভেন্টিলেটর প্রভৃতি সরঞ্জামের জন্য আমরা আমদানির উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু আজকের দিনে আমরা ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ পিপিই কিট, ২.৫ লক্ষ এন-৯৫ মাস্ক দেশের অভ্যন্তরেই তৈরি করছি। এই পরিমাণ প্রতিদিন বাড়ছে। ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভেন্টিলেটার এখন বিভিন্ন কোম্পানিতে তৈরি হচ্ছে যার দাম বাজার চলতি দামের চেয়ে অনেক কম। ১০ লক্ষেরও বেশি করোনা রোগীর জন্য শয্যা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিদিন ১.৫ লক্ষ সম্ভাব্য রোগীকে পরীক্ষা করা যায় এমন ল্যাবরেটরিও আমাদের প্রস্তুত।

বলতেই হবে, সময়মতো লকডাউন ঘোষণার ফলে ভারত অনেককাংশেই করোনার বৃহত্তর সংক্রমণকে ঠেকাতে পেরেছে। মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ এমন একটি জাতি হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে চলেছে যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার ও প্রগতির অধিকার সকলের জন্য হবে সমানভাবে প্রযোজ্য।

একথা বলা পুনরাবৃত্তি হবে না যে, বিগত ছ' বছরে ভারত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ছয় দশকের কর্মণ্যতার শূন্যতাকে মাত্র ছ' বছরের মধ্যে মুছে ফেলে নতুন ভারত গড়ার যাত্রায় অবিসংবাদিত কারিগর নিশ্চিতভাবেই শ্রীনরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী।

(লেখক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)

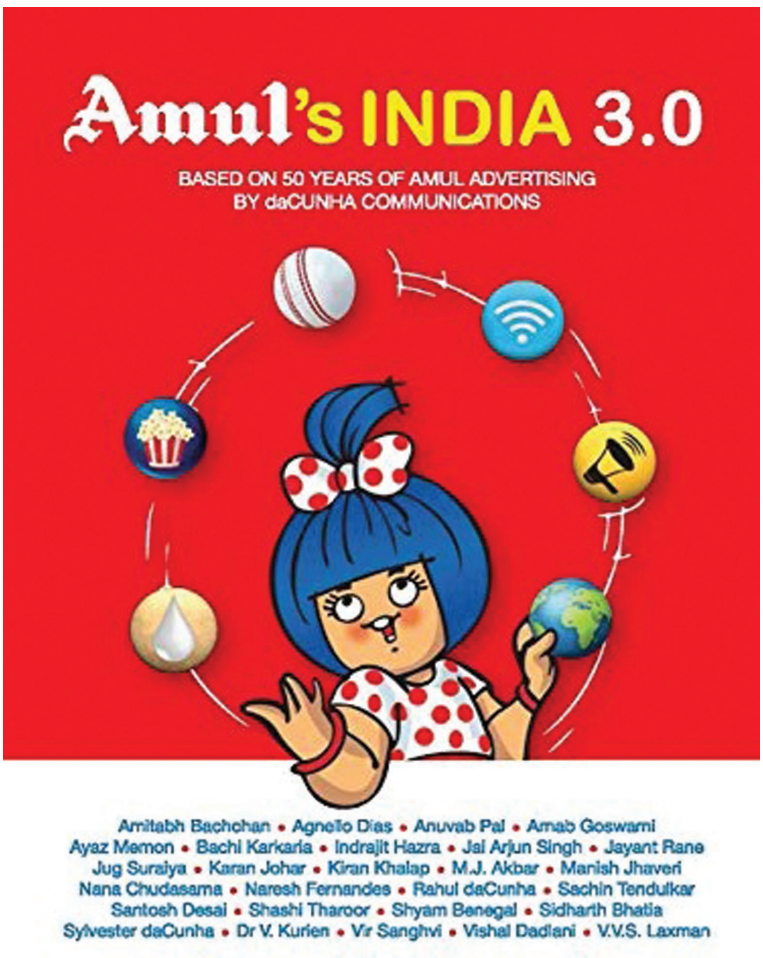

ছত্রপতি শিবাজী : এক বীরগাথা

শুভজিৎ আওন

ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের প্রধান নায়ক ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ । তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব, সামরিক দক্ষতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশে বহুধা বিচ্ছিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীসমূহকে একসূত্রে সংশ্লিষ্ট করে তাদের ইতিহাসগত ভাবে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব একমাত্র শিবাজীর। শিবাজীর কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুনে ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে এই অঞ্চল কৃষিকাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং দুর্গম গিরিপথ-সহ সুউচ্চ পাহাড় সমন্বিত এক প্রতিকূল পার্বত্য এলাকা। এই দুর্গম পার্বত্য এলাকাকে কেন্দ্র করে সমকালীন মুঘল ও বিজাপুর বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে যে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তার ভিত্তি এতটাই মজবুত ছিল যে তাকে অবদমিত করা মুঘল শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে শিবাজী ১৬২৭ সালে ১০ এপ্রিল পুনা জেলার উত্তরে শিবনের পার্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা জীজাবাঈ তাঁর প্রত্যাশিত সন্তানের মঙ্গল কামনায় শিবা-ভবানী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ও সেই কারণে এই দেবীর নামানুসারে ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাম রাখেন শিবা বা শিবরাজে। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে আহম্মদনগর রাজ্যের

মালিক অম্বরের অধীনে, সাময়িককালের জন্য মুঘলদের অধীনে এবং ১৬৩৩ সালে আহম্মদনগর রাজ্যের পতনের পর বিজাপুর রাজ্যের অধীনে সেনাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৬৩০ থেকে ১৬৩৬ সাল পর্যন্ত শাহজীর যাযাবর জীবন ও তুকাবাঈ মোহিতে নামে আর একজন নারীকে বিবাহ করার ফলে শিবাজী তাঁর পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৬৩৬ সালে মুঘল-বিজাপুর চুক্তির মাধ্যমে শাহজীর পুনা-সহ তাঁর অধিকৃত সকল স্থানের কর্তৃত্ব হস্তচ্যুত হয়েছিল, ফলে শিবনের দুর্গ থেকে শিবাজী বঞ্চিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শাহজী বিজাপুরের অধীনে কাজ করার সুবাদে বিজাপুরের থেকে জায়গির হিসেবে পুনা জেলার চাকন থেকে ইন্দাপুর ও শিরওয়াল পর্যন্ত অঞ্চল লাভ করেন। যেহেতু মুঘল-বিজাপুর চুক্তি অনুযায়ী শাহজী মহারাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, তাই ওই জায়গির অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য শাহজী তাঁর নাবালক পুত্র শিবাজীর অভিভাবক হিসেবে দাদাজী কোণ্ডদেবকে (মালথানের পূর্বতন কুলকার্নি) নিয়োগ করেছিলেন।

জীজাবাঈ শিবাজীকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন অতিবাহিত করার দরুন তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা গভীরতর হয়েছিল যা তাঁর পুত্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বড়ো হয়ে ওঠার দরুন মা ও পুত্রের মধ্যে স্নেহ গভীরতর হয়েছিল এবং মায়ের প্রতি শিবাজীর ভালোবাসা প্রায় আরাধ্য দেবীর উপাসনার পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাল্যকাল থেকে শিবাজী স্বাবলম্বী ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়ায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিলেন । তাই স্বাধীনভাবে রাজ্য

গঠনের ভাবনা তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাগতভাবে শিবাজী বাল্যকালে দাদাজী কোণ্ডদবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ, অশ্বারোহণ ও সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এছাড়া প্রাচীন ভারতের দুই মহাকাব্য শিবাজীর জীবন গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেইসময় পুনা জেলা আহম্মদনগর-মুঘল সংঘাত ও পরবর্তীকালে বিজাপুর বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং এক নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজমান ছিল। শক্তিশালী মারাঠা প্রধানরা দুর্বল মারাঠা প্রধানদের নিজ গ্রাম থেকে উৎখাত করত। কৃষকরা প্রায়শই লুণ্ঠনের শিকার হতো কোনও শক্তিশালী প্রশাসন ও সামাজিক শৃঙ্খলা না থাকার দরুন। কোনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা ও আইনি অধিকারের অনুপস্থিতি ছিল প্রাকশিবাজী-মহারাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই প্রেক্ষাপটে প্রথমে দাদাজী কোণ্ডদেব জনমাবশূন্য পুনা অঞ্চলকে পুনরায় জনবসতিপূর্ণ করে তুলতে ব্যবস্থা করেন ও আইন-শৃঙ্খলা পুনপ্রবর্তন করেন। শিবাজী দৃঢ়ভাবে একজন সৎ বিচারক ও শক্তিশালী প্রশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একজন তথ্য-অনুসন্ধানকারী জুরির (মাহাজার) পরমর্শ গ্রহণের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হতো। এইভাবে শিবাজী মহারাষ্ট্রব্যাপী এক সামাজিক চাহিদাকে দারুণভাবে পূরণ করেছিলেন, যা প্রাথমিকভাবে তাঁর সফল উত্থান সাধারণ মানুষের জনসমর্থন লাভ করেছিল। শিবাজীর কর্তৃত্ব তাই প্রথমে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছিল।

এই ভাবে মহারাষ্ট্রের জনজীবনে স্বাধীনতার উদ্দীপনা প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক মুসলমান শাসনের অধীনে থাকার পর এক-একজন স্বাধীনতা-সৈনিক হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

দাদাজী কোণ্ডদেবের অধীনে পুনা জেলার পশ্চিমাংশে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সমান্তরাল ৯০ মাইল দীর্ঘ ও ১২ থেকে ২৪ মাইল প্রশস্ত 'মাওল' অঞ্চলটি শিবাজীর দখলে এসেছিল। এই মাওল অঞ্চল থেকে শিবাজী অনেক সমরাধিনায়ক ও সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত শিবাজীর রাজ্যগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ১৬৩৪ সালে আহম্মদনগরের শেষ সুলতানের অভিভাবকত্বের দরুন শাহজী বিজাপুরের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে (১৬৩৩ সালে) জুনার, শাহগড়, নাসিক, ত্রিম্বক, চাকন, চামারগোণ্ডা, কোঙ্কনের তিন-চতুর্থাংশ যে অঞ্চলগুলি লাভ করেছিলেন, ১৬৩৬ সালে মুঘলরা বিজাপুরের উপর চাপ সৃষ্টি করে নতুন চুক্তির মাধ্যমে শাহজীকে ওই অঞ্চলগুলি থেকে বিতাড়িত করা হয়। শাহজীর উত্তরাধিকারী হিসেবে শিবাজী ওই অঞ্চলগুলিকে পুনরুদ্ধার করার শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, 'যে তরবারি যেভাবে ওই অন্যায় চুক্তিকে অনুমোদন করেছিল, শিবাজী তরবারির দ্বারা সেই চুক্তিকে সেভাবেই বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

১৬৪৭ সালে দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর আগে থেকে শিবাজী তাঁর রাজ্যগঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে শুরু করেন। ১৬৪৬ সালে তিনি বিজাপুরের থেকে সংঘাত ছাড়াই তোরনা দুর্গ দখল করে নেন। এই দুর্গের পাঁচ মাইল পূর্বে রাজগড় নামে এক নতুন দুর্গের নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী দু'বছর বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজী পুনের নিকট চাকন নামে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করেন। এছাড়া বারামতি ও ইন্দাপুর দুর্গের আধিকারিকরা শান্তিপূর্ণভাবে শিবাজীর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। ১৬৪৮ সালে মহাদজী নীলকণ্ঠ রাওয়ের উত্তরাধীকারীদের থেকে সুকৌশলে শিবাজী গুরুত্বপূর্ণ পুরন্দর দুর্গ দখল করেন। শিবাজীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণের পথে বিজাপুরের থেকে প্রাপ্ত মোরে পরিবারের অধীন জাওলি রাজ্য বাধা হয়ে দাঁড়ালে শিবাজী এক্ষেত্রেও সুকৌশলে চন্দ্ররাও মোরে ও তার উত্তরাধীকারীদের হত্যা করে ১৬৫৬ সালে জাওলি দুর্গ ও রাইরি অঞ্চল দখল করেন। জাওলির দু'মাইল পশ্চিমে প্রতাপগড় নামে শিবাজী একটি দুর্গ তৈরি করেন যেখানে তাঁর আরাধ্য দেবী ভবানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু তুলজাপুরের প্রাচীন ভবানী মন্দিরে যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। জাওলি দুর্গ দখলের পর ১৬৫৬'র এপ্রিলে পার্বত্য দুর্গ রায়গড় দখল করেন যা শিবাজীর রাজধানীতে পরিণত হয়। একই বছর তিনি সুপা দুর্গ দখল করেন পুনে অঞ্চলের পূর্বভাগ সুরক্ষিত হয়। এছাড়া তিনি একই অঞ্চলে রোহিদা ও পুনের উত্তর-পশ্চিমে টিকোনা, লোহগড় ও রাজমাছি দুর্গ দখল করে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করেন। ১৭৫৬ সালের নভেম্বরে বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ মারা গেলে দাক্ষিণাত্যে অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা থেকে শিবাজী লাভবান হয়েছিলেন।

১৬৫৬ সালে দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের ভারপ্রাপ্ত বিজাপুরের অংশ কল্যাণ অবরোধের সুযোগে শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে জুন্নার নগর আক্রমণ করে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেন। ১৬৫৭-এর শেষের দিকে শিবাজী জুন্নার নগরের ফৌজিদার মুহম্মদ ইউসুফকে পরাজিত করে কল্যাণ নগরটি দখল করেন ইতিমধ্যে বিজাপুরের সুলতান মুঘলদের সঙ্গে সমঝোতা করলে শিবাজী এককভাবে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক মনে করেন, ফলে শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে আগ্রহ দেখান। কিন্তু ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে বিশ্বাস করতেন না।

১৬৫৭ সালে শিবাজী কল্যাণ ও ভিওয়ান্ডি সহজেই অবরোধ করেন এবং কল্যাণ দখলের দখলের সময় শিবাজী সেনাপতি আবাজী সোনদেবকে সেখানে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। তখন আবাজী একজন সুন্দরী মুসলমান নারীকে বন্দি করে নিয়ে এলে শিবাজী বলেছিলেন, ''যদি আমার মা জীজাবাঈ তোমার মতো সুন্দরী হতেন তাহলে আমাকেও সুদর্শন দেখতে হতো''। এইভাবে শিবাজী নিজের মায়ের সঙ্গে ওই নারীর তুলনা করে, অলংকার ও বস্ত্র প্রদান করে ৫০০ অশ্বারোহীর নিরাপত্তা-সহ বিজাপুরে প্রেরণ করেছিলেন। এই নারী কল্যাণের পূর্বতন

বিজাপুর সুবেদার মুল্লা আহমদের পুত্রবধূ ছিলেন। রক্ষণশীল ঐতিহাসিক কাফি খান নারীর প্রতি শিবাজীর সম্মান প্রদানে নীতিপরায়নতার প্রশংসা করেন। ১৬৫৯ সালের শেষদিকে শিবাজী সমগ্র পুনা অঞ্চল, উত্তর সাতারা জেলা এবং কোলাবা ও থানে জেলার অর্ধাংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

১৬৫৯ সালের মধ্যে বিজাপুরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুর সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে আফজল খাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমঘাট অঞ্চলে ১০ হাজার সেনা প্রেরণ করে। মহারাষ্ট্রের অভিমুখে যাত্রাকালে আফজল খাঁ হিন্দ তীর্থস্থানগুলিকে বিশেষত মহারাষ্ট্রের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র পনঢারপুর লুঠ করে অপবিত্র করে যা পতোন্মুখ বিজাপুর রাজ্যের মুসলমান সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীলতাকে তুলে ধরে। এর ফলে আফজল খাঁ স্থানীয় দেশমুখের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। আফজল খাঁর সেনা যেখানে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধে দক্ষ ছিল সেখানে গেরিলা যুদ্ধে পটু শিবাজীর সেনাদল জাওলির অরণ্যে মোতায়েন থাকার দরুন আফজল খাঁর সেনাদলকে পার্বত্য গিরিপথের মধ্যে দিয়ে চলাচলের সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অন্যদিকে দুর্গে শিবাজীর রসদও ফুরিয়ে আসার দরুন উভয়পক্ষ সমঝোতায় রাজি হয়। ঠিক হয় শিবাজী আফজল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রতাপগড় দুর্গের নীচে যা কৌশলগত দিক থেকে শিবাজীর অনুকূল ছিল। সাক্ষাতের সময় শিবাজী ও আফজল খাঁ উভয়েই সশস্ত্র অবস্থায় হাজির হয়েছিলেন। শিবাজীর দিক থেকে আফজল খাঁকে সন্দেহ করার কারণ ছিল। কারণ এক দশক আগে একই পরিস্থিতিতে আফজল খাঁ এক হিন্দু সেনাধ্যক্ষকে বন্দি করতে এই ধরনের সাময়িক যুদ্ধবিরতির অনুষ্ঠান অমান্য করেছিল। শিবাজী তাঁর পোশাকের আড়ালে লোহার বর্মের আচ্ছাদন, পাগড়ির ভিতরে ধাতব মস্তক আচ্ছাদন এবং এক হাতে ছোটো তরবারি ও অন্য হাতে 'বাঘনখ' পরে এসেছিলেন। আফজল খাঁ আলিঙ্গনের অভিনয় করে শিবাজীকে পিষে মারার চেষ্টা করলে বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে দেন এবং তরবারির এক কোপে আফজল খাঁর মাথা কেটে ফেলেন।। আফজল খাঁকে হত্যার পর সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর সেনাবাহিনী বিজাপুর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করে। আফজল খাঁকে হত্যার এই ঘটনা মহারাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় কাহিনি হিসেবে প্রচলিত।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে শিবাজী শুধুমাত্র দক্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না, সামরিক সংগঠনের চিন্তাভাবনার দিক থেকে তিনি মুঘলদের থেকে অন্তত একটি দিকে অগ্রবর্তী ছিলেন। কারণ শিবাজী নৌবাহিনীর গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আফজল খাঁকে হত্যার পর তিনি কোঙ্কন অঞ্চলে কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এইজন্য তিনি ছোটো দ্রুতগতিসম্পন্ন নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। যদিও এই নৌবহর ইউরোপের বৃহদাকার নৌশক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না, তবে বাণিজ্যতরী আটক করতে সক্ষম ছিল। শিবাজীর এই নৌবহর গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনেকগুলি সমুদ্র দুর্গ গঠন যাতে জঞ্জিরার সিদ্দিদের মোকাবিলা ও প্রতিহত করা যায়। বস্তুত ক্ষুদ্র হলেও শিবাজীর নৌশক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ প্রশংসনীয়।

ঔরঙ্গজেব মুঘল সম্রাট হয়ে তাঁর মামা শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কন আক্রমণ করলেও শায়েস্তা খাঁ উত্তর কোঙ্কন অভিযান করে কল্যাণ দুর্গ দখল করে নেয় ও পুনের সন্নিহিত অঞ্চল বিধ্বস্ত করে। ১৬৬৩-এর এপ্রিল পর্যন্ত এক ধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকলেও শিবাজী এক রাত্রে (৫ এপ্রিল) অতর্কিতে শায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ করেন এবং শায়েস্তা খাঁর পুত্র ও তার কিছু অনুগামী নিহত হয় ও শায়েস্তা খাঁ নিজে আহত হয়। মুঘল শিবিরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে শিবাজীর এই আক্রমণ পুরোপুরি সফল ছিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ১৬৬৪ সালের জানুয়ারিতে শিবাজী মুঘলদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সুরাট বিধ্বস্ত করেন। শিবাজীর আগমনের সংবাদে সুরাটের তৎকালীন গর্ভনর ইনায়েত খাঁ পালিয়ে যায়। শিবাজী কয়েকদিনে অভিযান করে ব্যাপক ধনসম্পদ হস্তগত করেন। বস্তুত সুরাটে উপস্থিত হয়ে শিবাজী ঘোষণা করেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজ বা অন্য কোনও ব্যবসায়ীর ক্ষতি করতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন মুঘল প্রতিনিধি শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক পুনার সন্নিহিত অঞ্চল লুঠ ও এর ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। ১৬৬৪-এর ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সুরাটে অভিযান চালানোর পর ১০ জানুয়ারি শিবাজী সুরাট ত্যাগ করেন। ১৭ জানুয়ারি যখন মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সুরাটের গর্ভনর ইনায়েত খাঁ সুরাটে প্রবেশ করে তখন ক্ষুব্ধ জনতা তাদের ধিক্কার জানায় ও তাদের উপর ময়লা নিক্ষেপ করে। এতে ইনায়েত খাঁর পুত্র ক্ষুব্ধ হয়ে এক নিরীহ দরিদ্র হিন্দু ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। শায়েস্তা খাঁর ওপর আক্রমণ ও সুরাট বন্দর অভিযান মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদায় আঘাত হেনেছিল, বিশেষত সুরাট বন্দর শিবাজীর হাতে বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে প্রতিরোধ করতে অন্যতম প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ জয় সিংহকে প্রেরণ করেন।

জয় সিংহ ১৬৬৫ সাল ধরে পুনের চারপাশে শিবাজীর জায়গির বিধ্বস্ত করেন এবং একে একে বৃহৎ পুরন্দর-সহ শিবাজীর অনেকগুলি দুর্গ দখল করে নেন। শিবাজী যখন পুরন্দর দুর্গের নীচে জয় সিংহের শিবিরে প্রবেশ করেন তখন জয় সিংহের নির্দেশে শিবিরের বাইরে মুঘল বাহিনী নির্বিচারে শিবাজীর অনুগামীদের হত্যা করে। হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে শিবাজী জয় সিংহের প্রদত্ত সকল শর্ত মেনে নেন। মুঘলরা শিবাজীর ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করে শিবাজীকে কেবলমাত্র রাজধানী রায়গড়-সহ ১২টি দুর্গের অধিকার প্রদান করে। শিবাজীর অধীনে থাকা সব অঞ্চল মুঘলদের আনুগত্যাধীন করা হয় এবং শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে ৫০০০ মনসব প্রদান করা হয়। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট গর্ডনের মতে, পুরন্দরের উক্ত সন্ধি মুঘলদের কাছে শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার ছিল না, বরং তা ছিল সম্প্রসারিত সমঝোতার ফল যা মহারাষ্ট্রকে ক্ষমতার বাস্তবতা এবং জয় সিংহের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখলের সামগ্রিক পরিকল্পনাকে প্রতিফলিত করে। পুরন্দরের সন্ধি অনুযায়ী

শিবাজী কিছুকাল মুঘলদের অধীনে সেনাধ্যক্ষ হিসেবে চমকপ্রদ দক্ষতা দেখালেও জয় সিংহ মুঘলদের প্রতি শিবাজীর আনুগত্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। বিশেষত ১৬৬৪-এর শেষ দিকে শিবাজীর এক প্রধান সেনাধ্যক্ষ বিজাপুরে যোগদান করলে জয় সিংহ মুঘলদের প্রতি শিবাজীর আনুগত্য অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় জয় সিংহ ঔরঙ্গজেবকে শিবাজীর সঙ্গে মুঘল রাজধানী আগ্রায় সাক্ষাতের পরামর্শ দেন।

জয় সিংহের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও নিরাপত্তা জনিত চরম আশ্বাস লাভের পর শিবাজী ১৬৬৬-এর মে'র প্রথম দিকে ২৫০ জনের একটি ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু আগ্রার রাজদরবারে প্রথম থেকেই বিভিন্ন ঘটনায় শিবাজী ক্ষুব্ধ হন। শিবাজী রাজদরবারে উপস্থিত হলেও ঔরঙ্গজেব তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলেননি ও শিবাজীর উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও সম্ভাষণ প্রদান করেননি। নিম্ন-পদমর্যাদাভুক্ত অভিজাতদের ন্যায় শিবাজীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ক্রুদ্ধ শিবাজী প্রদত্ত সাম্মানিক উত্তরীয় প্রত্যাখান করেন এবং রাজদরবার থেকে বেরিয়ে যান। কারণ শিবাজী ছিলেন মারাঠা রাজা যেখানে ঔরঙ্গজেব তাঁকে বিজাপুরের নামমাত্র বিদ্রোহী জমিদার ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। এদিকে মুঘল রাজদরবারে অভিজাতদের নিজ পক্ষে টানার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা শিবাজীর কাছে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁকে কাবুলে নিয়োগের নির্দেশ দেন। কাবুলে গমনকালে শিবাজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। শিবাজী কাবুলে যেতে অস্বীকার করলে সেই নির্দেশ বাতিল হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ টানাপোড়েন ও শর্ত-প্রতিশর্তের পর জুলাইয়ের প্রথমদিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে দাক্ষিণাত্যে পলায়নের সুযোগ করে দেয়। শিবাজী অসুস্থতার ভান করে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মিষ্টি বিতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিতরণযোগ্য সেই সব বিশাল মিষ্টির ঝুড়ির একটিতে আত্মগোপন করে ত্রিস্তরীয় নজরদারি এড়িয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হন। এই পলায়ন এতটাই নিখুঁত ছিল যে পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব বার বার অনুসন্ধান করেও এই পলায়নের কৌশল খুঁজে বের করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত এই পলায়ন ঔরঙ্গজেবের জীবনভর অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা ঔরঙ্গজেব নিজের শেষ দলিলে লিপিবদ্ধ করেন।

আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শিবাজী তিন বছর মুঘলদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করলেও ১৬৬৯-এ মুঘলরা শিবাজীর আগ্রায় গমনের ব্যয় দাবি করলে সেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ভঙ্গ হয়। শিবাজী সেই সুযোগে মুঘলদের থেকে সিংহগড়, পুরন্দর, রোহিগ, লোহগড় ও মাহুলি দুর্গ জয় করে নেন। ১৬৭০-এর অক্টোবরে শিবাজী পুনরায় সুরাট অভিযান করে বিধ্বস্ত করেন ও ১৬৭১-এর পশ্চিম খান্দেশের মুলহের ও সলহের দুর্গ মুঘলদের থেকে জয় করেন। এই দুই দুর্গ লাভ করায় শিবাজী সুরাট বন্দরের বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। একই সময়ে তিনি নাসিক ও পুনের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করে নিজের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। ১৬৭২-১৬৭৩ সালে বিজাপুরের সুলতানের মৃত্যুর সুযোগে হুবলি লুঠ করেন ও পানহালা দুর্গ দখল করেন। এই ভাবে রাজ্যাভিষেকের আগে শিবাজী তাঁর রাজ্যকে আয়তনে বৃদ্ধি করেন।

মুঘল ও বিজাপুরের থেকে নিজ সামরিক দক্ষতায় বহু অঞ্চল ও দুর্গ জয় করে শিবাজী নিজ রাজ্য গঠন করলেও শিবাজী ও তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের কাছে শিবাজীর আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক না হওয়ার অসুবিধা অনুভূত হতে থাকে। কারণ তত্ত্বগতভাবে রাজপদে অধিষ্ঠিত না হওয়ায় একদিকে বিজাপুর ও মুঘলদের কাছে নামমাত্র বিদ্রোহী জমিদার হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন তেমনি বিজিত সব অঞ্চল ও জনজীবনের উপর তাঁর আইনি বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া শিবাজীর নেতৃত্বে ভোঁসলে মারাঠা গোষ্ঠীর উত্থান অন্যান্য সম সামাজিক মর্যাদার মারাঠা গোষ্ঠীকে ঈর্ষান্বিত করে। তারা শিবাজীর অধীনে না থেকে মুঘল ও বিজাপুরের প্রতি আনুগত্য প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিল শিবাজীকে একজন ভুঁইফোড় বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করে। সুতরাং এইসকল গোষ্ঠীর কাছে শিবাজীর মর্যাদা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং একটি আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক তাঁকে সকলের কাছে রাজা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারত এবং বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার শাসকের ন্যায় সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারত। সর্বোপরি বৃহৎ মহারাষ্ট্রীয় মননে শিবাজীকে হিন্দুধর্মের রক্ষক হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেছিল এবং স্বাধীন রাজা হিসেবে শিবাজীর পদমর্যাদার আনুষ্ঠানিক দাবির দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে হিন্দু জাতির সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী ছিল।

কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগা ভট্ট হিন্দু শাস্ত্রমতে শিবাজীকে একজন ক্ষত্রিয় রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ১৬৭৪-এর ৬ জুন রায়গড় দুর্গে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর বহু জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেন। অভিষেক কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেন। এই রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে শিবাজী শুধুমাত্র একজন সমকালীন অন্যান্য বৃহৎ রাজ্যের সমমর্যাদার রাজা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন না, তার সঙ্গে মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে এক হিন্দু রাজ্যের উত্থান হয়েছিল। আর এই উত্থান সম্ভব হয়েছিল সামরিক ও সাংগঠনিক দক্ষতার দ্বারা বিজাপুর ও মুঘলের মতো শক্তিকে বার বার পর্যুদস্ত করার মাধ্যমে। শুধু বিজেতা নন, প্রশাসক হিসেবে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন তা পরবর্তী এক শতাধিককালের বেশি সময় মারাঠা রাজ্যকে সর্বোভৌমত্ব ধরে রাখতে সহায়তা করেছিল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, "শিবাজীর চরিত-কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মতো হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন; কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নূতন শাখাপল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড়ো ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে– জাতি অমর অজেয় হয়।"

(হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

কিছু উদ্বাস্তু কাশ্মীরি মহিলার উপার্জনের মাধ্যম খাদি রুমাল

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

জেহাদি সন্ত্রাসের কারণে উদ্বাস্তু হবার পর জম্মু পৌঁছে হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারের সামনে ছিল এক অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ। সেই সময় আশ্রয়-সম্বল তো দূরের কথা, জীবনধারণের নূন্যতম প্রয়োজন খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিধেয়ের মতো কোনো কিছুর ব্যবস্থা করাও দুরূহ ছিল। তাসত্ত্বেও সেসব পরিবারের মহিলারা ভেঙে পড়েননি। এঁদের মধ্যে অনেকেই খাদির মাধ্যমে নিজেদের উপার্জনের পথ খুঁজে নেন। নগরোটা গ্রামের চোকবজিরাঁতে ইউসুফ মেহেরালি সেন্টারের মাধ্যমে মহিলারা আর্থিক উপার্জলের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

জম্মুর কাছেই অবস্থিত নগরোটার চোকবজিরাঁ গ্রাম। এই গ্রামের শতাধিক পরিবারের মহিলারা ইউসুফ মেহেরালি সেন্টারে খাদির রুমাল বানিয়ে চলেছেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ১৯৯০-এ ভয়ংকর সন্ত্রাসেরর জন্য সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সংস্থানটির মাধ্যমে তাঁদের আত্মনির্ভর বানানো হচ্ছে। খাদি ও গ্রমোদ্যোগ আয়োগ এখন এই ব্যাপারে শীঘ্রই কাজের বিস্তার করে চলেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি দিল্লিতে এই সেন্টার দ্বারা তৈরি রুমা 'লঞ্চ' করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের জনগণের কাছে আবেদন করেছেন, তারা যেন কমপক্ষে একটি করে রুমাল অবশ্যই কেনেন।

কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হবার পরে এই পরিবারগুলির খাওয়া-পরার সমস্যা দেখা দেয়। অনেকে দৈনিক মজুরের কাজও করেছেন। অনেক বছর পর্যন্ত কোনো স্থায়ী উপার্জন ব্যবস্থাও হয়নি তাঁদের। তখন খাদি দপ্তর এগিয়ে আসে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের মাধ্যমে ইউসুফ মেহেরালি সেন্টারের কথা মহিলারা জানতে পারেন। তাঁরা তখন এখানে প্রশিক্ষণ নেন। এখন তাঁরা এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছেন যে, প্রত্যেক মহিলা চারঘণ্টায় সত্তর থেকে দু'শোটি রুমাল বানিয়ে রোজ ২০০ থেকে ৩০০ টাকা উপার্জন করে থাকেন। মহিলারা এখানে সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকেন। ২০১৬ সাল থেকে এই সংস্থাটি কাজ করে চলেছে। ইউসুফ মেহেরালি সেন্টারের দায়িত্বে থাকা নম্রতা দেবী ও মখ্না দেবী জানান যে, এই সেন্টারটি দুঃস্থ ও দরিদ্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। এখানে মহিলাদের প্রথমে কাজ শেখানো হয়, তারপর কাজে নেওয়া হয়। প্রতিটি রুমাল বাবদ মজুরি দেড় থেকে দু'টাকা। সেন্টারে দু'টি ইন্টারলক ও পঞ্চাশটি সেলাই মেশিন আছে। আলাদা করে কাটিং মেশিনও আছে। রুমালের কাপড় সরবরাহ করে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ড।

খাদি গ্রামোদ্যোগ আয়োগের সহায়তায় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগ জম্মু-কাশ্মীরের স্টেট ডাইরেক্টর ডি. এস ভাটি জানিয়েছেন যে, আয়োগ ও পেটি এম-এর মধ্যে পাঁচ কোটি রুমাল বানানোর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রথম বছর দু'কোটি রুমাল বানানো হবে। তাছাড়া শুদ্ধ তুলো থেকে তৈরি সাদা রঙের খাদি রুমাল দেশের সমস্ত আউটলেটের সেন্টারে বিক্রি করা হবে। সরকারি কার্যক্রমেও পুষ্পগুচ্ছের সঙ্গে খাদি কাপড়ের তৈরি এই রুমাল উপহার দেবার প্রথা শুরু করা হচ্ছে।

সংস্থানটিতে কর্মরত নির্মলা দেবী বলেছেন, তাঁরা ১৯৯১ সালে কাশ্মীরের কুলগ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে জম্মুর কোট বজরাঁতে আসেন। কাশ্মীরে তাঁর স্বামী রণধীরের শুক্‌নো ফলের দোকান ছিল। এখানে এসে দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে জীবন কেটেছে। খাদির রুমাল বানিয়ে তাঁরা এখন দৈনন্দিন খরচ চালিয়ে নিচ্ছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পিঙ্কি দেবীর স্বামী রোশন কাশ্মীরে গাড়ি চালাতেন। তাঁদেরও কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হতে হয়। সংকটের মধ্যে দিল কাটছিল। বর্তমানে খাদির রুমাল বানিয়ে তাঁরা দুটি সন্তানকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

সন্ত্রাসের কারণে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার। খাদি ও গ্রামোদ্যোগের সহায়তায় এই সংস্থাটি যেভাবে কাশ্মীরি মহিলাদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয় ও অভিনন্দনযোগ্য। ■